বিদ্রোহী কবি নজরুল

বিদ্রোহী কবি নজরুল

শ্রীমতী অমিতা দেবী

॥ কল্পনা সাহিত্য মন্দির ॥
১৮, রজনী গুপ্ত রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায়
১৮, রজনী গুপ্ত রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীপূর্ণেন্দু শেখর বিশ্বাস
বিশ্বাস প্রিন্টিং হাউস
১৩০ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য—তিন টাকা

বিদ্রোহী কবি নজরুল

শ্রীরামমথন চট্টোপাধ্যায় কে—
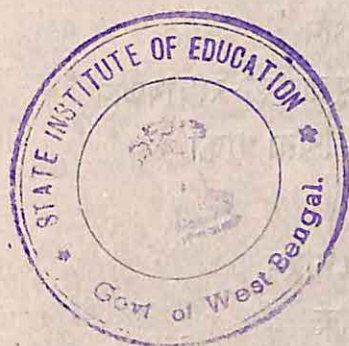
অমিতা দেবীর অন্যান্য বই

১ বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ (২য় মুদ্রণ)

২ বিনয়-বাদল-দীনেশ (২য় মুদ্রণ)

৩ কবি সুকান্ত (৩য় মুদ্রণ)

৪ বিপ্লবী সূর্য সেন

৫ ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকী-বাঘাযতীন

৬ ভারত রত্ন-ইন্দিরা গান্ধী

৭ দেশ বন্ধু

৮ রাজা রাম মোহন

৯ বিপ্লবী অরবিন্দ

কাজী নজরুল ইসলাম কবি-সৈনিক!

অতুলনীয় তাঁর দেশাত্মবোধ। এ দেশাত্মবোধের পরিচয় তিনি রাখলেন পত্র-পত্রিকায়। কার্য্য-আচরণে। মামুলী আইন ভঙ্গ করে তিনি জেলে যাননি, একেবারে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, পরশাসনের উচ্ছেদ চাই, চাই সশস্ত্র অভ্যুত্থান। তিনি জানিয়েছিলেন একেবারে রক্তের জন্য আবেদন। আর কোন্ কবি বলতে পেরেছেন, দুঃশাসনের রক্ত চাই!

আমাদের কাছে শুধু হালাল
দুশমন-খুন লাল সে লাল

কিন্তু তিনি তো শুধু পত্র-পত্রিকার নন। তিনি যে সাহিত্যেরও। তাই তাঁর লেখা হাউইয়ের মত স্বল্প আয়ুযুক্ত নয়—অগ্নি অক্ষরে লেখা প্রদীপ্ত মন্ত্র।

নজরুল বিদ্রোহী কবি।

এ বিদ্রোহ তাঁর সর্বত্র। সাহিত্য, দৈনন্দিন জীবনেও।

এই বিদ্রোহী কবির জীবন কথা, কাব্য ও কবিতার কথা জানার প্রয়োজনীতা কখনও ফুরায় না—ফুরাবেও না। কবিতায় ও গানে যে কবি দেশ বাসীর হৃদয়সমুদ্রে এনেছেন উচ্ছ্বাসের তথা কর্মের জোয়ার শ্রদ্ধাবনতা চিত্তে তাঁকে পৌঁছে দিচ্ছি প্রাণের প্রণাম।

॥ দোল পূর্ণিমা ॥
॥ ১৩৭৮ ॥

উনিশ শ' উনত্রিশের ডিসেম্বর।

এলবার্ট হল।

আয়োজন করা হয়েছে কবি সম্বর্দ্ধনার।

এই কবি সেই কবি যিনি 'কিষাণের জীবনের শরিক 'হ'য়ে' কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা' করেছেন অর্জন, যে কবি মাটির কাছাকাছিই রয়েছেন।

এই কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

সেদিন সম্বর্দ্ধনা সভার সভাপতি হয়েছিলেন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

অভিনন্দন পত্র পাঠ করলেন এস. ওয়াজেদ আলি।

অভিনন্দনের উত্তরে নজরুল বললেন ঃ

'আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই আমি নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহন করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই আমি কবি।

'আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুল দেখিনি, তাঁর চোখ ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা শীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব স্তুতি।

কেউ বলেন' আমার বাণী যবন কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করছি, গালাগালিকে গলাগলিতে চেষ্টা করছি। সে হাতে হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। কেননা একজনের হাতের লাঠি আরেক জনের আস্তিনে ছুরি।'

নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের শুরু বাইশ বছর বয়সে। কিন্তু সেই সাহিত্য সাধনার বীণাধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেল মস্তিষ্ক বিকৃত রোগের সূত্রপাতে। তখন

কবির বয়স তেতাল্লিশ। কিন্তু কবি এর মধ্যেই শোনালেন দেশের মুক্তির চেয়েও বড় কথা, সে মুক্তি মানুষের। এ মুক্তি বন্ধন থেকে পরিত্রাণের, এ মুক্তি ক্রন্দন হ'তে রেহাইয়ের। বিত্তের দারিদ্রের যেমন জ্বালা, চিত্তের দারিদ্রের ও তো সমান জ্বালা—এ দুই শ্রেণীর দারিদ্রকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই কবির আবির্ভাব। তাইতো কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হল:

ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।

আত্মসচেতন শিল্পাশ্রয়ী কবি নন, কবি স্বভাব-কবি।

তাই আধুনিক বুদ্ধিজীবী মনের সূক্ষ্ম মননশীলতার হয়তো অভাব নজরুলের কবিতায় আছে, কিন্তু ঘাটতি নেই বিন্দুমাত্রও তাঁর হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশের।

কবি প্রতিভা অস্থির চাঞ্চল্যে পরস্পর বিপরীত মনোভাবে, দ্বিধাগ্রস্ততায় যেন পরিপূর্ণ। জীবনের চরম দ্রারিদ্র, বাস্তবসত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি যেমন বারবার বিচলিত হয়েছেন তেমনি রোমান্টিক স্বপ্ন-বিলাসেও তিনি বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখ মেলে তাকিয়েছেন অনুভব করেছেন অন্তরে সেই মুগ্ধবোধকে। একই সঙ্গে তাই প্রকাশিত হয়েছে বিদ্রোহের কবিতা, প্রেমের কবিতা—স্বদেশ প্রেমের উজ্জীবনমন্ত্র ও গজল সঙ্গীত।

তাইতো সমালোচকের মন্তব্য:

"বিদ্রোহী কবির মধ্যে এমন কি মানসিক পরিবর্তন ঘটল যে, তিনি সংগ্রামী অসি ছেড়ে বাঁশী ধরলেন, যুদ্ধের তূর্যবাদন ছেড়ে দিয়ে পলাতকা প্রিয়ার প্রেম-স্মৃতির হার গাঁথতে বসে গেলেন চোখের জলের সূত্রদিয়ে? এর কোন অস্পষ্ট ছাপ কি কবির চিত্তাকাশের কোথাও ছিল না—সজল মেঘের যে রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার মধ্যেই সুপ্ত ছিল এর বীজ—'মোর একহাতে বাঁকা বাঁশের বাশরী, আর হাতে রণতূর্য।' সুতরাং বলা যেতে পারে, যে বাঁধন হারা যৌবন শক্তি তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছে, সেই একই শক্তি তাঁকে নারীপ্রেমের দিকে সবলে আকর্ষণ করেছে। কাজেই শুধু রণতূর্য নয়, বাঁশের বাঁশরীও বিদ্রোহীরই হাতের যন্ত্র। মহাকালী বামহস্তে ধরেছেন খড়্গ ও নৃমুণ্ড, আবার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দান করেন তিনি বরাভয়। পূর্ণতা ও-দুটিকে নিয়েই।"

তাই কখনো বা নজরুল কবি, কখনো বা রাজনৈতিক বন্দী। কখনো বা

তিনি গেয়েছেন সাম্যবাদের জয়গান আবার কখনো বা পরিণতি পেয়েছেন গ্রামোফোন কোম্পানির বাধা মাহিনার সুরকারে।

কিন্তু পরাজিত তিনি নন—কোথাও পরাজয় তাঁকে স্বীকার করতে হয়নি।

কবি নজরুল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বাণীটি তুলে ধরেছেন নিজেই :

'এখনো একথা ভাবতে পারিনি, ও লেখা আমার লেখা নয়, এ লেখা আমারই মাঝের আমার পরম বন্ধুর, আমারই সুন্দরের, আমারি আত্মবিজড়িত পরমাত্মীয়ের,······গোপনে পড়তে লাগলাম বেদান্ত, কোরাণ। আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোন্ বজ্রনাদ ও তড়িৎলেখার তলোয়ারে বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন আরও উর্দ্ধে যেতে লাগলাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণমন্দির জ্যোতিঃ। এই আমার স্বর্ণজ্যোতিঃ সুন্দরকে প্রথমে দেখলাম। ···এই আমি প্রথম পুথিগত সুন্দরকে দেখলাম। এইরূপে চাঁদের আলো, সকাল-সন্ধার অরুণ কিরণ ঘন-শ্যাম-সুন্দর বনানী, তরঙ্গ হিল্লোলিত ঝর্ণা, তটিনী, কুলহারা নীলঘন সাগর দশদিক বিহারী সমীকরণ, আমায় জড়িয়ে ধরল, আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মতো সখার মতো কথা কইল। ···তবে দাও বন্ধু, দাও আমার দু' ধারী তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষান-শিঙ্গা, দাও আমার অসুর সংহারী ত্রিশূল ডম্বরুর্ধ্বনি। দাও আমায় বাঙলার সুন্দরবনের বাঘাম্বর ; দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমার জটাজুটে শিশুশশীর স্নিগ্ধহাসি ; দাও আমার তৃতীয় নয়ন, দাও সেই তৃতীয় নয়নে অসুর-দানব সংহারী শক্তি।'

নজরুলের কবিতায় তাই হয়তো দেখা দিয়েছে বারবার চারটি বিষয়—অবমানিত মনুষ্যত্ব, নির্যাতিত সমাজ, শোষণ-ক্লিষ্ট জীবন, আর পরাধীনতার শৃঙ্খল অক্টোপাশে জর্জরিত জন্মভূমি।

দেশসেবা, স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, গণবিক্ষোভের জাগরণ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিতাড়ন, সার্বভৌম সাম্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা—এই তো ছিল কবির সমগ্র জীবন বাণী, ছিল কবির জীবন দর্শন। "তাঁর কাব্যে বিদ্রোহের মূল সুর হচ্ছে ঘোরতর অসাম্যের বিরুদ্ধে সাম্যের বিদ্রোহ, ধনী সমাজের বিরুদ্ধে সর্বহারার বিদ্রোহ, অত্যাচারির বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের বিদ্রোহ, ছুৎমার্গগামী সমাজপতি ও বৈড়াল ব্রতী ভণ্ডদলের বিরুদ্ধে মানবতার বিদ্রোহ।"

নজরুলের যে সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি বিদ্রোহী কবি।

সমাজের নীচুতলার জনজীবন মনের অবরুদ্ধ বাণীকেই যে তিনি তাঁর কাব্যে ভাষা দিয়েছেন। হয়তো বা উচ্চ দার্শনিকতা ও গভীর মননশীলতার অভাব রয়েছে তাঁর কাব্যে, কিন্তু পৌরুষ বলিষ্ঠতায় তিনি যে দোসর হীন।

পরাধীন ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক দুরবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহন করেও, প্রত্যাশিত উচ্চ শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত হয়েও শুধু মাত্র প্রতিভা আর স্বভাব কবিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি বলে যিনি খ্যাতি-গঠিত স্বর্ণ সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি নজরুল।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

আঠার শ' নিরানব্বই খৃষ্টাব্দের চব্বিশে মে।

বর্দ্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুলের জন্ম।

পিতা কাজী ফকির আহমদ, মাতা জাহেদা খাতুন।

দরিদ্র এ পরিবার।

পর পর চার ছেলে মারা গেছে ফকির আহমদের। মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে এদের বাঁচাতে পারেন নি তিনি। পিতা মাতার বুকে শেল্ বিঁধেছে বারবার। তাই পঞ্চম পুত্র নজরুলের মুখ যখন তিনি দেখলেন তখন তাঁর মনে একটা বিরাট প্রশ্ন, এ ছেলেও আবার তাঁর দুঃখের কারণ হবে না ত? তাই অনেক ভেবেচিন্তে আগে থেকেই ছেলের নাম রাখলেন, দুঃখু মিঞা।

শৈশবে যে নাম পিতা রেখেছিলেন দুঃখ প্যাওয়ার ভয়ে সে নামের প্রতি কিন্তু ভ্রুকুটি হানলেন নজরুল।

তিনি তো আসলে দুঃখ দেওয়ার জন্য জন্মগ্রহন করেন নি, আসলে দুঃখ পাবেন বলেই তিনি জন্ম নিয়েছেন।

আট বছর বয়সেই পিতাকে হারালেন নজরুল।

পিতা মারা গেলেন, অকুলে ভেসে গেল নজরুলদের সংসার।

পিতা কাজী ফকির আহমদ কিছুই রেখে যেতে পারেন নি।

শুধু রেখে গিয়েছেন স্ত্রী-পুত্রের জন্য অফুরন্ত ভাবনা।

জাহিদা খাতুন ভেবে পাননা, কী করে তিনি কি করবেন। কি করেই বা নুরুকে বড় করে তুলবেন।

কিন্তু অসীম তাঁর ধৈর্য্য, প্রবল তাঁর ধর্ম বিশ্বাস।

ধৈর্য্য আর ধর্মকে অবলম্বন করেই তিনি শুধু দিন গুনে চলেছেন, কত দিনে তার নুরু, তার দুঃখু মানুষ হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া আর তাঁর করবারই বা কি ছিল ?

কিশোর বয়সেই নজরুল সংসারের সাশ্রয়ের আশায় দুপয়সা রোজগারের ধান্দায় কখনও বা সমাধিতে করেছেন খাদেম গিরি আবার কখনও মসজিদের এনামতি। চুরুলিয়া গ্রামে তাঁদের বাড়ির দক্ষিণই ছিল পীর-পুকুর। এই পুকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হাজি পাহলোয়ান—একজন খ্যাতিনামা ফকির। সেই পুকুরেরই পূর্ব পারে ছিল সেই ফকিরের সমাধি আর পশ্চিম পারে একটা মসজিদ।

নজরুলের পিতা—পিতামহ এই সমাধি আর মসজিদের খিদমত করে গেছেন জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত।

এখন নজরুলকে মাঝে মাঝে এ কাজ করতে হয়।

কখনও বা কাছাকাছি গ্রামে মোল্লাগিরিও।

কিন্তু নজরুল কখনও বা হাসি-গানে উচ্ছল আবার কখনও পরম ঔদাসীন্য তাঁকে পেয়ে বসেছে।

সেই ছোট বেলাতেই তিনি মৌলবির কোরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনেছেন। একেবারে তন্ময় তখন তিনি। কোথাও বা হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেছন ভটচার্যি মশায়—সেখানেও কিন্তু নজরুলের সমান আগ্রহ, সমান মনোযোগ। গ্রামে আগত সাধু-ফকির, বাউল-সুফি, সবাই নজরুলের আত্মীয়।

কিন্তু এতে পেট ভরে না।

অতএব রোজগারের ধান্দা করতে হল নজরুলকে।

তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো।

এগারো বছর বয়সেই কবি যোগ দিলেন লেটোর দলে। লেটো গান আর কবি-গানে পাথক্য নেই তেমন। দুই দলে মিলে গানের মাধ্যমে চলে কথা কাটা-কাটি—চাপান ও উতোর।

নজরুল শুধু গান করেন তা নয় পালাও বাঁধেন।

লেটো দলের ওস্তাদকে বলা হয় 'গোদা কবি।' নজরুলও ছোট্ট থেকে ক্রমশঃ ওস্তাদ হয়ে উঠলেন।

কিন্তু লেটো দল দীর্ঘকার কবিকে বেঁধে রাখতে পারল না।
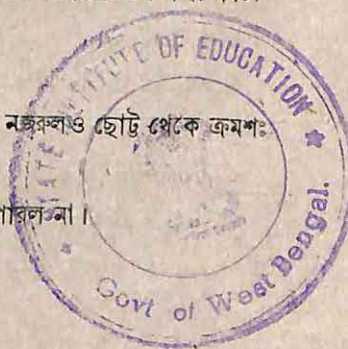
পালালেন তিনি।

আসানসোলে একটা রুটির দোকানে কাজ পেয়েছেন।

মাস-মাহিনা আট টাকা।

একদিন লেটোর দলে জুটে ছিলেন তিনি শুধু গলায় গান সম্বল করেই। কণ্ঠে গান নিয়ে রাজ্য জয়ে বের হয়েছিলেন তিনি।

পথকেই সেদিন করেছিলেন সঙ্গী।

আশা ছিল, পথই তাকে দেবে হয়তো বা পথের সন্ধান।

রেল লাইনের ধারে একটা গাছের ছায়ায় গানের আসর বসেছে।

একটা গুড্‌স ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।

গার্ডসাহেব লক্ষ্য করলেন এই গানের আসরটিকে।

লাল আলো জ্বলছে সিগ্‌ন্যালে অতএব গাড়ী ছাড়তে এখন বেশ দেরী আছে। ততক্ষণ গান শুনে সময় কাটানো যাবে। সবুজ আলোর সঙ্কেত না পেলে তো আর গাড়ী ছাড়ছে না।

একটা সদানন্দ ছেলে আসরটা খুব জমিয়েছে।

গায়ে হাতকাটা জামা, পরণে ধুতি, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাটা, কিন্তু হাসিতে ভরপূর এ ছেলে? আন্তরিকতায় উচ্ছল সে।

গান শেষ হল।

গান শেষ করেই উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। বললে, চললাম।

এমন আসরটা নষ্ট করে দিতে সকলেরই আপত্তি। সকলেই চায়, অন্ততঃ আর দু-একখানা, গান যেন ছেলেটি গায়।

কিন্তু কে শোনে কার কথা?

আমি এক জায়গায় বেশিক্ষণ।

চলে যাচ্ছে সে।

গার্ডসাহেব ছেলেটাকে ধরলেন। ছেলেটি কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত আর পারে না।

তোমার নাম কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় ছেলেটি, দুখু মিয়া।

তুমি এ দলের গায়ক নও   আবার প্রশ্ন করেন গার্ডসাহেব।

ছেলেটির আরও ছোট্ট উত্তর, না।

তাহলে তুমি কোন দলের হয়ে গান গাও ?

কোন নির্দিষ্ট দল আমার নেই। যখন যে ডাকে তখন সে দলের হয়েই গান গাই।

থাক কোথায় ?

তারও ঠিক নেই। বলে কি ছেলেটি ? কিন্তু হেসে উত্তর দেয় সে, যেখানে যখন যে ডাকে সেখানেই সেদিন থেকে যাই।

গার্ডসাহেবের মুখে মৃদু হাসি। দিগ্বিজয়ের হাসি। মনে মনে একটা ফন্দি এঁটে ফেলেছেন তিনি এরই মধ্যে।

আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাব !

চমকে উঠল আসর শুদ্ধ লোক। যে দলের আসর বসেছিল সে দলেরই ওস্তাদ বাসুদেব এবার মিনতিতে ভেঙ্গে পড়ে।

সাহেব আমরা তো কোন অন্যায় করিনি। ওকে ছেড়ে দিন। তাছাড়া ওর সঙ্গে আমাদের দলের তো সতাই কোন সম্পর্ক নেই।

গার্ডসাহেবের হাসি এবার আরও একটু উজ্জল।

ওকে নিয়ে যাব, ওকে একটা চাকুরি দেব বলেই।

চাকুরি ! কণ্ঠস্বরে যেন একটা সমর্পণের আকুলতা।

ছেলেটি যে কি চাকরিই চায়।

দুখু মিঞার, নজরুলের তখন যে চাকুরির বড় প্রয়োজন।

কেন, চাকরি করবি না ?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন নজরুল না, না কোরব। কিন্তু আমি যে মুসলমান।

তাতে কি হয়েছে। আমিও সব জাতটাত মানি না। তাছাড়া আমিও তো খৃষ্টান।

নজরুল খুশী !

জিজ্ঞেস করলেন, কি কাজ করতে হবে ?

আমাকে কেবল গান শোনাবে।

নজরুলের খুশী তখন বাধ ভাঙ্গা জলোচ্ছ্বাস।

মাকে খবর দিও, আমি কাজ পেয়েছি। জানান তিনি লেটোর দলের অধিকারী বাসুদেবকে।

গার্ড সাহেব উঠে এলেন নিজ কামরায়।

সঙ্গে দুঃখু মিঞা।

গাড়ী তখন চলতে শুরু করেছে।

একটা গান গাইব?

দুঃখুর মন তখন উধাও নিরুদ্দেশের সঙ্গী হওয়ার বাসনায় পথ তার জানা নয়, নাই বা হল, কিন্তু মনটা'ক উধাও হয়ে যেতে দিতে ক্ষতি কি? কেউ তো আর নিষেধের বেড়ি পরিয়ে দিচ্ছে না।

গম্ভীর মুখে গার্ডসাহেব বললেন, এখন গান নয়।

ভয় পেলেন নজরুল।

চাকরির পরিচয় পেলেন না? কত মাইনে পাবেন তাও জানেন না? কোথাও গাড়ী থেকে তাকে নামিয়ে দেওয়া হবে না—তারই বা ঠিক কি?

শেষ পর্যন্ত গাড়ীটা এসে একটা ষ্টেশনে পৌছাল।

শেষ হল তাদের পথ চলা।

গার্ডসাহেব বল্লেন, নামো দুঃখু। এখানেই আমার ডিউটি খতম। চল এবার কোয়ার্টার যাব। কাছেই!

উনি বললেন কাছেই। কিন্তু ষ্টেশন থেকে গার্ডসাহেবের কোয়ার্টারের দূরত্ব অন্ততঃ মাইল দেড়েক নিশ্চয়ই।

বাড়ী ফিরলেন গার্ডসাহেব সঙ্গে দুঃখু মিঞা।

কিন্তু কোথায় চাকুরী?

কিন্তু কোথায় বা তার গান?

সাহেব তো এসেই মদ নিয়ে বসলেন।

ব্যকুল হয়ে উঠলেন নজরুল।

চোখে পড়ল ঘরের এক কোনে রাখা একটা টেবিল হার্মোনিয়াম। নজরুলের চোখ পড়ল আর একজনের উপর।

তিনি এই বাড়ীর গৃহিনী।

লক্ষ্মী-শ্রী মণ্ডিত এই রমণী কিন্তু কেমন যেন বিষাদক্লিষ্ট।

সাহেব বললেন, তোমার জন্যই দুঃখুকে নিয়ে এসেছি। খুব ভাল গান গায় ও। গান বাঁধতেও পারে।

গৃহিণী নীরবে শুধু হাসলেন, কিন্তু কেমন যেন বিষাদে মাখা সে হাসি।

না, গান করাটা গৌণ। আসল কাজ হল সাহেবের বেয়ারাগিরি করা। সাহেবের খাবার টিফিন কেরিয়ারে করে নজরুলকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। সাহেবের ডিউটি অফ্ হয়ে গেলে সঙ্গী হ'তে হয় সাহেবের ষ্টেশন থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত দীর্ঘ দেড় মাইল পথ। আরও একটা কাজ ছিল সেটা দু'দিন অন্তর আসানসোল থেকে মদ কিনে আনার।

মেমসাহেবের মুখের দিকে যখন তাকিয়ে থাকতেন নজরুল তখন তার একবারও মনে হত না মেমসাহেব। তিনি ভাবতেন, শাশ্বতী দিদির রূপ যেন মূর্তি পেয়েছে এই দিদিটির মধ্যে।

নজরুলের একঘেয়ে লাগে এই কাজ।

তবু একটা সান্ত্বনা তার রয়েছে। মরুভূমির বুকে মরুদ্যানের মতই। সেটি তার দিদির ঘরের হারমোনিয়াম।

অপেক্ষা করেন, কখন তার ডাক আসবে গান গাইবার জন্য।

একদিন সুযোগ এল।

সেদিন সাহেবের রাতের ডিউটি। কোন দূরদূরান্তের পথে আজ গার্ডসাহেব যাত্রা করেছেন কেই বা তার খবর রাখে?

স্নেহময়ী দিদি ডেকে নিয়ে আসে টেবিল হার্মোনিয়ামের কাছে।

একটা গান শোনাও দুঃখু।

নজরুলের উৎসাহের বাঁধ ভেঙেছে তখন।

কিন্তু পরক্ষণেই কেমন যেন সঙ্কোচ।

কি গান তিনি শোনাবেন তার দিদিকে।

দিদি, আমি তো লেটোর দলে গান করতাম সে গান কি তোমার ভাল লাগবে?

খুব ভাল লাগবে। তুমি গাও তো।

আর কোন ওজর আপত্তি নয়।

নজরুল গান ধরলেন শকুনি-বধের পালা হ'তে।

গানের সুরে সুরে আনন্দের সবুজ সমারোহে উতরোল হয়ে উঠল সেই নির্জন কক্ষটি।

দিদিও গাইলেন নজরুলের অনুরোধে।

কিন্তু গান, সুর, কথায় নজরুল বিমুগ্ধ। মনে মনে তার উথাল পাতাল প্রশ্ন ঃ এমন গান কি তিনি রচনা করতে পারবেন ? সৃষ্টি করতে পারবেন কি এমন সুরের মায়াজাল।

দিদির স্নেহধারায় সিক্ত নজরুল ভাবেন, এ স্নেহ কি তার কপালে সইবে ? দুঃখ পেতেই তো তিনি জন্ম নিয়াছেন।

আর দিদি ?

দিদি জানতেন বন্ধনহীন দুঃখুকে কোন কুবন্দনে আবদ্ধ রাখা চলবে না।

তাই একেবারে বিনা নোটিশেই নজরুলের রাণীগঞ্জের সুখের বাসা ভাঙল।

গার্ডসাহেব একদিন কাছে ডেকে নজরুলকে বললেন, তুমি এবারে চলে যাও দুঃখু।

অবাক দুচোখ মেলে তাকিয়ে থাকলেন নজরুল গার্ডসাহেবের মুখের দিকে।

কেন ? তার কি অপরাধ ?

তার কিশোর চোখ দুটো যে নিস্পাপ।

তিনি না হয় গার্ডসাহেবেয় কথা মত ফিরিঙ্গি পট্টির বুকিং ক্লার্কের স্ত্রীর প্রথম পক্ষের মেয়েটিকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়েছেন বুকিং ক্লার্কের বাড়ীতে।

এই তার মস্ত অপরাধ।

কোন একসময় মেয়েটির মা তার প্রথম পক্ষের স্বামীকে বেফাঁস বলে ফেলেছিল, মেয়েটি একজন মুসলমান বয়ের সঙ্গে পালিয়াছে।

কথাটা মিথ্যে। পালানোর প্রশ্ন অবান্তর।

আসলে মেয়েটাকে বাঁচানোর জন্য আর নিজে বাঁচবার জন্য এই মিথ্যার আশ্রয়।

পরে কিন্তু মহিলাটির দুঃখের অন্ত রইল না। কেন সে দুঃখুর নামে মিথ্যে

বলতে গেল ? সেতো তা চায়নি। অসতর্ক রসনাকে ধিক্কার জানানো ছাড়া তখন আর কোন গত্যন্তর নেই।

দুঃখুর কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

গার্ডসাহেব দুঃখুকে অযথা পুলিশ কেলেঙ্কারীর হাত হ'তে বাঁচাবার জন্যই চলে যেতে বললেন, এছাড়া তার উপায়ও ছিল না নিদেন কিছুদিন দুঃখু মিঞা গা ঢাকা দিয়ে তো থাকুক।

অতএব উপায় নেই।

পাত্‌তাড়ি গুটাও এখান থেকে।

গার্ডসাহেব দুঃখুকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, এই পঞ্চাশটা টাকা রাখ দুঃখু। তোমার মাহিনা।

অবাক দুঃখু মিঞা।

সে কী এত টাকা ? আমার চাকরি তো মোটে দু'মাস।

হিসেব করে দেখিনি দুঃখু। যাওয়ার সময় তোমাকে একটা কথা বলি দুঃখু তুমি গান কখনও ছেড়ো না।

কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিলেন নজরুল টাকাগুলো।

এবার পথ।

পথে নামবার আগে দিদিকে একবার প্রণাম করতে হবে।

এই দিদিটি তার কছে যে অনেকখানি আসনই জুড়ে ছিল।

তাইতো পরবর্তীকালে নজরুল লিখলেন ঃ

'অনন্তকে খোঁজার পথেই যে কদিন কেঁদেছি, যে গান গেয়েছি, যে সুর সৃষ্টি করেছি, যে কবিতা লিখেছি, তা যদি কবিতা হয়ে থাকে তবে তা সেই সুন্দর মুখখানিরই কৃপা—সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। যদি তা কবিতা না হয়ে থাকে, আমার দুঃখ নেই। কেননা আমি আমার প্রকাশের ব্যকুলতার উন্মাদনায় কী প্রলাপ বকেছি তা যদি গোলাপ বকুল হয়ে রূপ পরিগ্রহ না করে থাকে—সে আমার অক্ষমতা, অপরাধ নয়।'

আবার সেই পুরানো পথে প্রত্যাবর্তন।

আসানসোলের রুটির দোকান।

আবদুল ওয়াহেদ এই রুটির দোকানের মালিক।

ষ্টেশনের কাছেই এ দোকান, অতএব চাহিদাও অত্যন্ত বেশী।

কাকডাকা ভোর হতেই শুরু হয়ে যায় দোকানের কাজ।

ময়দা মাখা, রুটিপাকানো, রুটি বিক্রয় করা, হিসাব রাখা—সবই করতে হয় নজরুলকে।

মাস মাহিনা পাঁচটাকা।

সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ছুটি মেলে রাত দুপুরে।

তখন নিজেকে তিনি পান আপন করে। তখন সঙ্গী বাঁশী, হারমোনিয়াম, গান। আবার কোনদিন হয়তো বা একা একা বসে থাকা নিঃস্তব্ধ অন্ধকারের মুখোমুখি হয়ে।

দারোগা সাহেব রজিফুল্লা সাইকেলে ঘুরে বেড়ান।

একদিন থমকে দাঁড়ালেন এই রুটির দোকানের কাছে।

কে এই ছেলেটি ?

এত সুন্দর গান গায়, অথচ এই রুটির দোকানে বাঁধা পড়ে রয়েছে।

দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন নজরুল, রুটি চাই ?

না রুটি আমার চাইনা। তোমাকে চাই।

নজরুল বিস্ময়ে হতবাক। কথা বলতে পারেন না তিনি।

স্কুলে পড়েছ কোনদিন ? জিজ্ঞেস করলেন দারোগা সাহেব।

পড়েছি! মারুন হাইস্কুলে পড়তাম। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ছাত্র আমি।

তাহলে পড়া ছাড়লে কেন ?

লেটোর দলে যোগ দিলাম কিনা তাই।

কিন্তু তোমাকে কবি হ'তে হবে যে। লেখাপড়া তোমাকে শিখতেই হবে।

কেমন যেন বিমর্ষ নজরুল। রাশিরাশি ভাবনা এসে তার মাথায় জড়ো হয়েছে। তাইতো তাহলে কি করবেন তিনি ?

আমার সঙ্গে যাবে তুমি ?

নতুন ডাক—নতুন পরিবেশ, নতুন স্থানে যেন নজরুলকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার জন্য তিনি সদাই উন্মুখ হয়ে রয়েছেন।

হ্যাঁ, যাব।

পেছনে পড়ে রইল রুটির দোকানের ছকে বাঁধা রুটিন।

বেরিয়ে এলেন তিনি পথে রফিজুল্লা সাহেবের হাত ধরে।

নজরুলের চোখেমুখে তখন একটা উৎসাহ, বড় হওয়ার, বিস্তীর্ণ হওয়ার পথের সন্ধান পেয়েই।

রফিজুল্লা সাহেবের স্নেহের আকর্ষণকে অস্বীকার করার মত অলঙ্কার নজরুলের নেই। থাকবেই বা কেন? এই স্নেহের মূল্য কি কম?

অতএব বর্দ্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রাম যার জন্মভূমি সেই জন্মভূমি পরিত্যাগ করে তিনি হাজির হলেন মৈমনসিংহ জেলার কাজীর সিমলা গ্রামে। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে একেবারে পূর্ববঙ্গ।

এখানেই রফিজুল্লা সাহেবের বাড়ী।

নজরুলকে তিনি ভর্তি করে দিলেন দারিরামপুর হাই স্কুলে।

কাজীর-সিমলা মৈমনসিংহ জেলার একটা অখ্যাত পল্লীগ্রাম। সুতরাং এখানে স্কুল কোথায়? পড়াশুনা করবার সুযোগও বা কৈ? সুতরাং কাজীর-সিমলা গ্রাম হতে পাঁচমাইল দূরে দরিরামপুর ছাড়া গত্যন্তরই বা কী?

পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতে হ'বে এ পথে।

তাতেই বা আপত্তি কিসের?

"শিকল বাঁধা পা নয় এ, শিকল ভাঙা কল॥"

ফ্রি-শিপে পড়াশুনা করবার সুযোগ পেলেন নজরুল এ স্কুলে। ভর্তি হলেন ক্লাশ সেভেনে।

স্কুলের মাষ্টার মশাইরা নজরুলের মেধা ও রচনা শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস, এমন সচরাচর মেলেনা। পাঠ্যপুস্তকে একটু মন দিলে এছেলের ভাল রেজাল্ট করতে বেগ পেতে হবেনা একটুও।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ধরা বাঁধা, নিয়ম মাফিক পড়াশুনার প্রতি তেমন তাঁর আকর্ষণ নেই। তার চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণের মনে হয় তাঁর কাছে পাঁচ-মাইল পথ।

পথের মাঝে একটা মস্ত বটগাছ, এই বটগাছের ছায়ায় রাখাল ছেলেরা গরু

চরাতে এসে বিশ্রাম নেয়, ঠুনিভাঙার বিলে বড় বড় মাছের ঘাই মারা তার কাছে স্কুলের তুলনায় স্বর্গ। স্কুল পালিয়ে রাখাল ছেলেদের জটলায় যোগ দিতে তাই নজরুলের খুব আনন্দ। ওদের সঙ্গে ভাবও হয়ে যায়। সময় কেটে যায় ওদের সঙ্গেই কখনও বা তামক খায় আবার কখনও বা ঠুনিভাঙার বিলে ছিপ ফেলে বসে থাকে মৎস্য শিকারের আশায়।

রফিজুল্লা মাঝে মাঝে সস্নেহ শাসন-পাশে বাঁধেন, বইগুলো নিয়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও বসবার চেষ্টা কর নজরুল।

কিন্তু কে শোনে তার কথা।

তবু শেষ পর্য্যন্ত বইয়ের সঙ্গে আড়ি করেও পরীক্ষায় পাশ করে গেলেন তিনি।

তাহলে আর কেন ?

কেন বৃথা পড়ে থাকা কাজীর-সিমলায় পড়ে থাকা অর্থহীন বলেই মনে হয় নজরুলের কাছে।

তাই ছাড়তে হল তাঁকে কাজীর-সিমলা।

একদিন আসানসোলের আবতুল ওয়াদের রুটির দোকান তিনি ছেড়ে এসে-ছিলেন ওয়াহেদকে কিছু না বলেই, তার অনুমতি না নিয়েই আর আজ আবার তিনি ছাড়লেন কাজীর-সিমলা ; পেছনে পড়ে রইল রফিজুল্লা সাহেবের স্নেহচ্ছায়া যে স্নেহচ্ছায়াকে একদিন তিনি উপেক্ষাভরে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি।

"আমারে বাঁধবি তোরা সে বাঁধন কি তোদের আছে।
আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাছে।"

পেছনে পড়ে রইল রাখাল ছেলের সঙ্গ লোলুপ ছায়া ফেলা বট গাছ, পড়ে রইল ঠুনিভাঙার বিলের কাকচক্ষু জলে মাছদের ঘাই মারা।

পথই যে তাঁর ঘর।

সুতরাং চুপিসারে, রফিজুল্লা সাহেবকে একেবারে না জানিয়েই পথে নামলেন।

সোজা হাজির হলেন রাণীগঞ্জে।

কিন্তু পড়াশোনার প্রতি একটা আকর্ষণ জেগেছে তার এরই মধ্যে। অতএব নিজেই এবার ভর্তি হলেন শিয়াড়শোল রাজস্কুলে, থার্ডক্লাশে।

নজরুল ভাল ছাত্র। ভাল ছাত্র হিসাবে খ্যাতি পেলেন আর স্কুলের মাইনেও

তাকে দিতে হল না। ফ্রি-শিপে পড়ার সুযোগ পেলেন তিনি। স্কুল বোর্ডিং-এ থাকারও সুযোগ পেলেন। থাকা খাওয়া বাবদও তাকে কোন খরচ দিতে হবে না।

বরং শিয়াড়শোলের রাজা মাসিক সাতটাকা বৃত্তি পাইয়ে দিলেন নজরুলকে।

অতএব অধ্যয়ণ তপস্যায় নিজেকে নিমগ্ন করার এর চেয়ে বেশী সুযোগ আর কি আশা করতে পারেন তিনি?

বৃত্তির টাকা নিয়ে বোর্ডিং-এ ফিরলেন তিনি।

তার ভাই আলি হোসেন এসেছে দেখা করতে।

ভাইয়ের ম্লান মুখ দেখে নজরুলের বুঝতে বাকী নেই তার আগমনের হেতু।

না, কোন প্রশ্ন নয়। তার প্রয়োজনই বা কি? অহেতুক প্রশ্নে মনকে বিক্ষিপ্ত করে তো লাভ নেই। নেই এতে সমস্যার সমাধান।

বৃত্তির টাকাটা তুলে দিলেন ভাই আলি হোসেনের হাতে।

দারিদ্র্য সহ্য করার অভ্যাস তাঁর হয়ে গেছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, দারিদ্র্যকে জয় করার জন্যই যে তাঁর জন্ম।

তাই অভাব আর অনটন, দুঃখ আর দারিদ্র্য সহ্য করেই দু'দুটো বছর কেটে গেল।

দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন তিনি। প্রবেশিকা পরীক্ষার চৌ-কাঠ ডিঙোতে আর মাত্র একটা বছর বাকী।

এল উনিশ শ' সতের সাল।

তখন প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ চলছে। বিশ্ব যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু আলোচনার নেই যেন।

বন্ধু শৈলজানন্দকে ডাকলেন নজরুল।

ষ্টেশনে যাবে?

শৈলজা সম্মতি দিলেন অনায়াসে, যাব।

শৈলজার বিশ্বাস:

নজরুল ষ্টেশনে যাবে যখন তখন নিশ্চয়ই সেখানে কিছু দেখার আছে, জানার আছে, উপভোগ করারও আছে।

ওরা যে সমপাঠী, অভিন্ন হৃদয় বন্ধু।

না, ওরা একই স্কুলের ছাত্র নয়। সাহিত্য সূত্রে ওরা বাঁধা পড়েছেন বন্ধুত্বও হ'য়েছে গাঢ় সাহিত্য মমত্বে।

কোলকাতা হ'তে তোমার কোন আত্মীয় আসবে নাকি, বল না নুরু?

শৈলজার মনে কৌতুহলী প্রশ্ন। কিন্তু নজরুল যেন মূর্তিমান প্রতীক্ষা কোন উত্তর দেন না তিনি।

পৌঁছলেন ওরা ষ্টেশনে।

ট্রেনও এল সময় মতো।

কিন্তু কোথায় আত্মীয়? সামনের কামরাটা সৈন্যে বোঝাই।

দেখলেই বোঝা যায়, ওরা সব বাঙালী।

বাঙালি পল্টন। ওরা যুদ্ধে চলেছে। হয়তো বা কেউ মরবে, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী হবে ওরাই।

নজরুল হাত তুলে ওদের অভ্যর্থনা করলেন, বন্দেমাতরম্।

ওরাও প্রত্যাভিবাদন জানাল। হাজার হলেও বাঙালী পল্টন। সারা ষ্টেশন সোচ্চার হয়ে উঠল ওদের কণ্ঠ উচ্চারিত মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্রে। বন্দে মাতরম্।

গাড়ীটা আবার দুলে উঠল। গার্ড সাহেবের সবুজ আলোর সঙ্কেতে। চলে গেল পল্টন বোঝাই গাড়ীটা সম্মুখপাণে।

শৈলজা আর নজরুল ষ্টেশন চত্বর থেকে বাইরে এলেন। এবার ফিরতে হবে ওদের।

নজরুল বললেন, এই পল্টন দেখার জন্যই ষ্টেশনে এসেছিলাম।

শৈলজা খুশী। নজরুলকে তারিফ না করে তার উপায় নেই। যুদ্ধে মৃত্যু বরণের মত গৌরবের আর কীই বা হ'তে পারে?

নজরুল জিজ্ঞেস করলেন শৈলজাকে, যুদ্ধে যাবে?

শৈলজা রাজী। বললেন, হ্যাঁ, যাব।

তাহলে চলো। দেরী করে লাভ নেই। আসানসোলের এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করি। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

এসব ব্যাপার নজরুলের নখদর্পণে।

শুরু হল দুই বন্ধুর শলাপরামর্শ।

নজরুল বললেন, যুদ্ধ তো আসলে একটা বিদ্যা। আর কোনো বিদ্যাই বিফলে যায় না।

এ বিদ্যা আবার কি কাজে লাগবে, এক যুদ্ধ ছাড়া?

যুদ্ধের কাজেই লাগবে।

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আবার যুদ্ধ করবে নাকি?

হ্যাঁ, তবে এবারে ইংরাজদের হয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি আর যুদ্ধ হ'তে যদি বেঁচে ফিরি তাহলে যুদ্ধ যাত্রা হবে ইংরাজদের বিরুদ্ধেই। দেশকে স্বাধীন করাই যে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য শৈল।

নজরুলের কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। যুদ্ধে মরে গেলে তিনি আফশোস্ করবেন না, কিন্তু বেঁচে ফিরলে? যদি যুদ্ধ জয় শেষে আবার ফিরে আসেন তবে তিনি চাকরীর উমেদারী নিয়ে ঘুরবেন না, আবার যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হবেন। ক্ষেত্রটা শুধু পাল্টে যাবে।

অবাক হল শৈলজা।

দু'বন্ধু ঠিক করে ফেললেন তাদের আশু কর্তব্য।

হাজির হলেন আসানসোল।

উদ্দেশ্য এস-ডি-ওর কুঠি। লক্ষ্য : যুদ্ধের খাতায় নাম লেখানো।

অবারিত প্রবেশ পেলেন দুই বন্ধু এস-ডি-ওর কুঠিতে। আর্দলি চাপরাসির বেড়া ডিঙোতে কষ্ট করতে হল না তাদের।

আর্জি রাখলেন সাহেবের কাছে!

সাহেব মহাখুশি ওদের কথায়।

খুশি হবেনই বা না কেন?

ওরা তো তাদের হয়েই লড়তে চলেছে। আর এ যুদ্ধে তাদের সৈন্য চাই। আরো, আরো সৈন্য। এমন সবল দুটো কিশোর—এ যে মস্ত বড় শিকার।

ওদের চিঠি লিখে দিলেন তিনি। বললেন, এই চিঠি নিয়ে তোমরা রিক্রুটিং অফিসারের সঙ্গে দেখা কর। তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। কোথায় যেতে হবে তার ঠিকানা চিঠির উপরেই লেখা রইল।

লেমনেড খেয়ে, বিস্কুটের টিন উপহার নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন দুই বন্ধু—নজরুল আর শৈলজানন্দ।

এবার কোলকাতা। রিক্রুটিং অফিস। তারপর করাচি। ট্রেনিং – আর তার পরেই ওদের এত আশা আর স্বপ্নের যুদ্ধ।

প্রসন্ন খুশীতে ঝলমল করে ওঠে নজরুলের চোখ দুটো। নতুন প্রাণের উন্মাদনায় চঞ্চল ওরা দু'জনেই!

কোলকাতায় এলেন ওরা দু'জনেই।

রিক্রুটিং অফিস খুঁজে বার করলেন আসানসোলের এস-ডি-ও সাহেবের লেখা চিঠির উপরের ঠিকানা মিলিয়ে।

মামুলি স্বাস্থ্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত রয়েছে এখানে।

ওটা কিছু নয়! লোক দেখানো ব্যাপার। দৈর্ঘ্য আর বুকের ছাতির মাপই হল আসল কথা।

এই স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নজরুল পাশ করলেন অতন্ত্য অনায়াসে। বেগ পেতে হল না তাকে বিন্দুমাত্রও।

কিন্তু একী? শৈলজার বুকের মাপ কম পড়েছে।

এ হতে পারে না।

প্রতিবাদ জানায় ওরা।

কিন্তু রিক্রুটিং অফিসোরের এক কথা।

বাড়ী ফিরে যান, কিছুদিন ভাল খাওয়া দাওয়া আর ব্যায়াম করুন। স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আবার না হয় পরে আসবেন।

আসল ব্যাপার কিন্তু অন্য রকম। শৈলজানন্দের মাতামহ রায় সাহেবের কারসাজি। এই অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট জানতে পেরেছিলেন শৈলজার অভিসন্ধি। সুতরাং তাঁর নির্দেশ এসেছে রিক্রুটিং অফিসোরের কাছে, যে কোন উপায়েই হোক শৈলজার যুদ্ধ যাওয়া বন্ধ করতেই হবে। সুতরাং উপযুক্ত ছাড়পত্র তিনি পেতে পারেন না। রায় সাহেবের ও শৈলজার পরিবারকে শোক-দুঃখ দুর্দশার সাগরে ভাসতে দিতে পারেন না রিক্রুটিং অফিসার।

কিন্তু নজরুল?

তাকে বাধা দেবার কে আছে?

তিনি তো সব বন্ধন মুক্ত।

আমি একাই যাব শৈল, তুই কিছু ভাবিস্ না। ভগবানের অভিসন্ধি হয়তো ভিন্ন।

বিষাদ-ক্লিষ্ট শৈলজানন্দ।

ওর বিষাদ মাখা মুখটির দিকে চেয়ে রইলেন নজরুল ক্ষণকালের জন্য তারপর বললেন, আমার জন্য দুঃখ করিস নে ভাই। আমি বেঁচে থাকব, ফিরেও আসব। আসলে ভয়কে আমল দিলেই ভয় পেয়ে বসে। তা না হলে দুঃখই বা কোথায় আর ভয়ই বা কোথায়? কিছুই নেই। আসলে ভয়ও নেই, দুঃখও নেই।

চোখ মুছতে মুছতে বিদায় নিলেন শৈলজা।

নজরুল একাকী চললেন যুদ্ধে।

পথের কাঁটা রক্ত মাখা চরণ তলে একলাই দলন করার আহহ্বান শুনেছেন তিনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

সৈনিক হিসাবে যোগ দিলেন নজরুল।

না, এর আগে এদেশের আর কোন কবি যুদ্ধে যাননি।

নতুন উন্মাদনায়, নতুন আবেগে নজরুল তখন পরিপূর্ণ। স্কুল পালিয়ে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে, সম্মুখসমরে যোগ দিতে এসেছেন যে তিনি।

দুঃসাহসী নজরুল বন্ধন-হীন।

যোগ দিলেন উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি পল্টনে। নজরুলের ভাষায় 'বঙ্গবাহিনী'। প্রথমতঃ এলেন লাহোর, সেখান থেকে নৌশেরা—পেশোয়ারের কাছাকাছি। সৈনিকের শিক্ষানাবিশি শেষ হল। শিক্ষা সমাপনান্তে তাঁকে ফিরে আসতে হল করাচিতে। এই করাচিতেই তখন হেডকোয়ার্টাস রয়েছে—সেখানেই বহাল হলেন তিনি।

এখানে সৈনিক জীবনের কঠোরতা রয়েছে, রয়েছে সুদৃঢ় নিয়ম-কানুন, তবু অবসর মুহূর্তগুলো তিনি ভরে তুললেন সাহিত্য দিয়ে। যতই নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধনে বেঁধে রাখা যাক না কেন সাহিত্য যে কোন সময়ে সেখানে জ্বলতে পারে বিদ্রোহের আগুন। একদিন নজরুল ছাত্রজীবন থেকে পলাতকা হয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন। আর সেই বিদ্রোহ আরও গভীর হয়ে উঠল যুদ্ধের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে সাহিত্যের সন্ধান করে। একী কম কথা!

শিয়াড়শোলের স্কুলে নজরুল যখন ছাত্র তখনই ফার্সি শিখেছিলেন। আর যুদ্ধে এসে পাঞ্জাবি মৌলবি সাহেবের খেয়ালে সেই ফার্সিশেখা চরিতার্থতায় বিমণ্ডিত হয়ে উঠল।

সেতো একটা নিতান্ত খেয়ালের বশেই মৌলবি সাহেব নজরুলকে একদিন হাফিজের একটা কবিতা শোনালেন। কিন্তু সেই কবিতা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে পড়লেন নজরুল। অপূর্ব তার ধ্বনি, কী ছন্দ! কী রহস্যের চাবিকাঠি লুকানো রয়েছে সেই কবিতায়। কিন্তু অর্থ? না, অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি সেদিন তঁরে পক্ষে মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল।

আমাকে ফার্সি শেখাবেন মৌলবিসাহেব?

মৌলবিসাহেব রাজি।

শেখবার জন্যই উন্মুখ।

শেখানো চলল ফার্সি, পড়া হল হাফিজ।

আর নজরুল অনুবাদ করলেন হাফিজের রুবাইয়াৎ:

আনতে বল পেয়ালা শারাব
পার্শ্বে বসে পরাণ-বঁধুর
নিঙারি লও পুষ্পতনু
তথ্বঙ্গীর অধর আঙুর

কখনও বা করাচীতে, কখনও বা সাগরের বেলাভূমিতে বসে নজরুল তাঁর সাহিত্য সাধন শুরু করলেন। লিখতে শুরু করলেন গল্প, কবিতা। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হল 'সওগাতে' 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী'। আর তাঁর প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হল বঙ্গীয় মুসলমাল সাহিত্য পত্রিকায়।

শুরু হল হাফিজের কবিতার অনুবাদ।

নজরুল হাফিজের একটি গজল অনুবাদ করলেন, নাম দিলেন আশায়'।

একটা বিরাট আশা নিয়ে তিনি এ কবিতাটা পাঠিয়ে দিলেন 'সবুজ পত্রে'র অফিসে। ওই পত্রিকায় কবিতাটি যেন প্রকাশিত হয় সে আশা নিয়েই।

কিন্তু মনোনীত হল না।

সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী সহকারী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে বললেন, নজরুলকে জানিয়ে দাও, কবিতাটি আমার পছন্দ হয়নি।

কিন্তু সে কথা লিখতে পারলেন না পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। নজরুলকে একথা তিনি লিখবেন কী করে!

অতএব হাজির হলেন 'প্রবাসী' অফিসে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই। সহসম্পাদক চারু বন্দোপাধ্যায়কে পড়তে দিলেন কবিতাটা। তাঁর পড়া শেষ হলে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের কাগজে প্রকাশের জন্য এ কবিতা মনোনয়ন পেতে পারে কিনা?

পারে—খুব পারে।

প্রবাসীতে প্রকাশিত হল 'আশায়'।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নজরুলকে লিখলেন, তাঁর কবিতা সবুজ পত্রের বদলে প্রবাসীতে প্রকাশ হয়েছে বলে তিনি কি ক্ষুণ্ণ হবেন?

না, নজরুল ক্ষুণ্ণ হননি বরং বন্ধুত্ব সূত্রে বেঁধে নিলেন তিনি পবিত্রকে, নজরুল লিখলেন:

"সবুজ পত্রে পাঠানো কবিতা প্রবাসীতে বেরিয়েছে এতে কবিতার মর্যাদা বেড়েছে কি কমেছে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে পারছি না। সবুজপত্রের আভিজাত্য থাকলেও প্রবাসীর মর্যাদা কম নয়। তাছাড়া প্রচার? প্রবাসীতে প্রকাশিত কবিতা কত বেশি লোকে পড়বে। কথাটা আসলে এ নয়। পারস্যের কবি হাফিজের চোখে আমি দেখতে পেলাম আমার বাঙলা দেশের সবুজ ঘাস আর ছোট্ট জুঁই ফুলের চবিটি। আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের গন্ধটুকুও তো বাঙালীর খুব চেনা। তাই হাফিজের কবিতাটি যেন খাঁটি বাংলার কথা। অবশ্য বাঙ্গালীর কাছে পারস্যের এই সমর্মিতার খবরটুকু পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব আপনার।"

সেই করে যুদ্ধে এসেছিলেন নজরুল!

আর আজ দু'বছর পরে ছুটি মিলল। সেও মাত্র সাত দিনের। হলই বা মাত্র সাত দিন। এই সাতদিনেই বাংলা দেশকে তার মাকে দেখবার জন্য তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

অতএব ছাড়ো করাচী, চল বাংলা দেশ।

হঠাৎ একেবারে বিনা নোটিশে একটা রিক্সা চেপে নজরুল শৈলজার মেসে হাজির হলেন।

শৈলজা তখন মেসে ছিলেন না। ফিরে এলেন তিনি। এসেই সাক্ষাত পেলেন আগন্তুকের। নজরুলকে একেবারে চেনাই যায় না। বিজাতীয় পোষাক পরিচ্ছদে একেবারে কেতা-দুরস্ত মিলিটারী তখন তিনি। তাছাড়া স্বাস্থ্য আগের তুলনায় এখন অনেক ভাল হয়েছে। সুগঠিত দেহ, মাথা ভরা ঝাঁকরা চুল। চলায়-বলায়, হাসি গানে, দেহে-মনে-প্রাণে নজরুল এখন আরও বেশি প্রাণখোলা। অথচ সমস্ত বৈসাদৃশ্যের অন্তরালে উঁকি দিচ্ছে অন্তরের এক আপনজন ?

শৈলজার দিকে তাকিয়ে নজরুল বললেন, তোমার চেহারা এমন হল কি করে ?

তবুতো এখন অনেক ভালো, ভাই। ম্যালেরিয়ায় ভূগে ভুগে একটা পিলের ডিপো হয়ে পড়েছিলাম। হাড় জিরজিরে চেহারা আর মাথায় কয়েকগাছা চুল। বীর হৃদয়ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়তো সেই চেহারা দেখে।

নজরুল হেসে উঠলেন শৈলজার কথায় প্রত্যুত্তরে। প্রাণমাতানো নবযৌবনের জোয়ার আনা সে হাসি।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দু তিনটে দিন।

দুই বন্ধু একে অন্যের সান্নিধ্য ও সাহচর্যের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে রইল। এক সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যাওয়া, সিনেমা দেখা একেবারে নগদ চার আনা হিসেবে খরচ করে, তারপর ট্রামে করে সারা কোলকাতা ঘুরে বেড়ানো। একটা অপূর্ব উন্মাদনা !

নজরুল একদিন শৈলজার কাছে প্রস্তাব রাখলেন।

চল, আমরা বত্রিশ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীটে যাই।

কেন ? সেখানে গিয়ে কি লাভ ?

বারে। সেখানেই তো যাব। নজরুলের চোখেমুখে একটা দারুণ উৎসাহ। ওই স্থানেই তো যাব মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার অফিস, মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবের আস্তানাও সেখানে।

মুজফ্‌ফর আহমদ নজরুল আর তার কবিতা সম্পর্কে বড় বেশী আগ্রহী।

হবেনই বা না কেন ?

মুজফ্‌ফর সাহেব নিজে বিপ্লবী, নিজে মানব-ধর্মে বিশ্বাসী। তার সেই বিশ্বাস আর বিপ্লবের মহাজারগণ দেখেছেন নজরুলের মধ্যে। তিনি কি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন, না থাকা সম্ভব? তাই আগ্রহটা অত্যন্ত অভিপ্রেত।

কিন্তু আমি কেন যাব? শৈলজা আপত্তি করেন?

বা, যাবেই না বা কেন? তুমিও তো ভাই লেখক।

লেখক হলাম কোথায়? আজ পর্যন্ত কোন লেখা ছাপাই হল না।

হবে নিশ্চয় হবে। ভরসা রাখার মূল্য কি কখনও ব্যর্থ হতে পারে?

নজরুলের মন তখন নতুন স্বপ্নে বিভোর।

আমরা দুজনে জগৎ মাতিয়ে দেব শৈলজা।

নজরুল আবার ফিরে এলেন করাচিতে।

যোগ দিলেন আপন কর্মস্থলে।

কিন্তু কতদিন? তাঁর মন বলে খুব বেশী দিন নয়। হয়তো বা খুব শীঘ্রই বঙ্গবাহিনী ওরা ভেঙ্গে দেবে এমন আশঙ্কা নজরুল করেছিলেন। তা নাহলে শৈলজানন্দকে তিনি লিখলেনই বা কেন?

"আমাদের বঙ্গবাহিনী ভেঙ্গে দেবার কথা হচ্ছে। ভেঙ্গে দিলে আর কোনদিকে তাকাব না, তোমার আস্তানায় গিয়ে উঠব। তার পর যা থাকে কপালে।"

শেষ পর্যন্ত বঙ্গবাহিনী ভেঙ্গে দিল ব্রিটিশ সরকার।

সত্য সত্যই একদিন উজ্জল স্বাস্থ্য, উদ্দাম হাসি আর উচ্ছ্বল প্রাণ মূলধন করে নজরুল হাজির হলেন কোলকাতায়। একেবারে শৈলজার মেসে এসে উঠলেন।

শৈলজাকে নজরুল বললেন, তোর এখানে চলে এলাম। আমাকে একটু জায়গা দে।

আমি আর কতটুকু জায়গা দিতে পারব, ভাই। আমার এই পাশের সিটটা অবশ্য খালি আছে।

প্রতিবাদ জানাল নজরুল, তোর পাশের খালি সিটের উপর আমার বিন্দুমাত্রও লোভ নেই, তোমার হৃদয় আকাশের বিস্তৃতিটুকু শুধু আমাকে দাও।

শৈলজাকে জড়িয়ে ধরলেন নজরুল তার বুকে।

শৈলজা এবারে ভিন্ন কথা পাড়েন।

থাক সে সব কথা। কিন্তু করবি কী? হৃদয়ে তো আর পেট ভরবে না। টাকা রোজগারের ধান্দা তো করতেই হবে।

তা তো হবেই। একটা কোন চাকরি জোটানো যায় না? প্রশ্ন করেন নজরুল। কী চাকরি?

নিদেন সাব রেজিষ্ট্রারির চাকরিও তো পেতে পারি।

দূর, ইংরেজের গোলামি করবি শেষটায়?

কিন্তু তাছাড়া আর কি করব বল্? নজরুলের কণ্ঠে একটা বিষাদ।

শৈলজা একটা সহজ সমাধান করে দেন নজরুলের সমস্যার, গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে পথে পথে গান গেয়ে বেড়াবি। শৈলজার উৎসাহের অন্ত নেই, দেখাবি কত রোজগার হয়। কণ্ঠে যার গান আছে আর সেই গানে যখন প্রাণ আছে তখন তার আর ভাবনা কিসের, ভাই?

সত্যইতো নজরুলের ভাবনা কি?

ঠিক বলেছিস ভাই, গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করেই বেড়াব। আমরা তো সুরের কাঙাল। সুর ভিক্ষা তো আমাদের করতেই হ'বে।

নলিনীকান্ত সরকারের বাড়ীতে নজরুল তখন অতিথি। শুনতে পেলেন রাস্তায় একজন ভিখারী আর একজন ভিখারিনী হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে! উর্দু গজল। কিন্তু সে কী সুর। ব্যাকুল হয়ে উঠলেন নজরুল। এমন সুযোগ ব্যর্থ হতে দিতে পারা—যায় না। এই তো ভিক্ষার উপযুক্ত ক্ষণ।

নলিনীদা ওদের তোমার বৈঠকখানায় ডাকো, ভাই। ওদের গানটা একবার শুনি। ওই সুরটার যে আমার খুব প্রয়োজন।

নজরুলের ব্যাকুলতায় বাধ্য হয়েই সাড়া দিয়েছিলেন নলিনীকান্ত সরকার।

ডেকে পাঠালেন ভিখারী আর ভিখারিনীকে।

ওরা এল।

বৈঠকখানা ঘর সুরে সুরে পূর্ণ হয়ে উঠল। সুরের অমৃতে তখন পরিপূর্ণ বৈঠকখানা ঘরটি।

আর নজরুল সেই সুরে বিভোর।

খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে পড়লেন তিনি। ওদের কণ্ঠ নিঃসৃত সুরকে তিনি ধরে রাখবেন তার স্বরচিত গজল গানে।

নিশি ভোর হল জাগিয়া
পরাণ পিয়া
কাঁদে পিউ-কাঁহা পাপিয়া
পরাণ পিয়া।
গেয়ে গান চেয়ে কাহারে
জেগে র'স করি এপারে
দিলি দান কারে এ হিয়া
পরাণ পিয়া ॥

শৈলজানন্দের মেসে দীর্ঘকাল থাকা নজরুলের পক্ষে সম্ভবপর হলনা।

না, শৈলজা কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করেন নি।

আসলে বেঁকে বসল মেসের চাকরেরা। ওরা জানাল, ওদের সাফ কথা। নজরুলের এঁটো বাসন ওরা ধুতে পারবে না।

নজরুল প্রতিবাদ করলেন না একটুও। গুছিয়ে নিলেন জিনিস-পত্র।

শৈলজাকে বিপদে ফেলতে চান না তিনি। তা ছাড়া শৈলজা অপ্রস্তুত হবেনই বা কেন?

কিন্তু ম্লানমুখে শৈলজা এগিয়ে এলেন নজরুলের কাছে।

কোথায় যাবে, নজরুল?

কলেজ ষ্ট্রিটে। আহমদ সাহেবের আস্তানায় আপাততঃ গিয়ে উঠব।

শৈলজা নজরুলের এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

হ্যাঁ, তাই চল ভাই, ওই আশ্রয়ই তোমার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

বের হয়ে এলেন ওরা দুজনেই পথে। লক্ষ্য : বত্রিশ নম্বর কলেজ ষ্ট্রিট। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিস। জননেতা মুজফ্ফর আহমদ তো ওইখানেই আছেন।

শৈলজা পৌঁছে দিলেন নজরুলকে আহমদ সাহেবের আস্তানায়।

এস, এস, তোমারই প্রতীক্ষায় আমি এতদিন ছিলাম নজরুল।

শৈলজা নিশ্চিন্ত !

আহমদ সাহেবের সাদর আহ্বানে শৈলজার দুশ্চিন্তার বোঝাটা এখন বেশ খানিকটা লাঘব হয়েছে।

দু'টো দিন কেটে গেল।

নজরুল মাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমিকেও। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।

হাজির হলেন স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি চুরুলিয়ায়।

থাকলেন কয়েকটা দিন।

কিন্তু কলকাতায় তো ফিরে আসতেই হবে।

ফেরার পথে বর্দ্ধমানে নেমে পড়লেন নজরুল। হাজির হলেন জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে। সাবরেজিষ্ট্রারের চাকুরি যদি মেলে এই আশা নিয়েই একটা দরখাস্ত দিয়ে এলেন সেখানে।

একটা চাকরীর তার খুব প্রয়োজন।

ভদ্র গোছের একটা চাকরী না পেলে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাই বা হয় কী করে ?

কলকাতায় ফিরে এলেন নজরুল।

কেটে গেল বেশ কয়েকটা দিন।

একদিন একটা চিঠি পেলেন তিনি। সাব-রেজিষ্ট্রারির চাকরির ইণ্টারভিউ এর চিঠি। নজরুল চিঠিটা দেখালেন মুজফ্ফর আহমদ সাহেবকে।

তিনি তো অবাক !

সে-কি তুমি শেষ পর্য্যন্ত সাব-রেজিষ্ট্রার হবে ?

নজরুল বললেন, কেন সাব রেজিষ্ট্রার হওয়ার কি যোগ্যতা নেই আমার ? ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। এখন সাব-ডেপুটি হওয়াই আমার উচিত।

সে কথা আমি বলিনি নজরুল, বললেন মুজফ্ফর সাহেব, তোমার যোগ্যতার পরিমাপ আমি করতে চাইনি। কিন্তু তোমার চাকরির চেয়ে তোমার সাহিত্য যে অনেক বড়। চাকরি না হয় পেলে। তারপর ?

তারপর আর কি, চাকরি কোরব। সাহিত্যও কোরব।

তা কি হয়? এ যে চাকরি তাতে তোমাকে হয়তো এমন সব গ্রামে যেতে হবে যে কোথাও সাহিত্যের আবহাওয়াই নেই। তোমার প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট কোর না নজরুল।

তবে? এ কথাতো তিনি একবারও ভাবেন নি। চাকরি করার উদ্দীপনা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসে। আলো নেই কোথাও। শুধু অন্ধকারের হাতছানি। নজরুল কেমন যেন বিমর্ষ।

আশ্বাস দিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ। পরম বন্ধুর মত হিতৈষণার প্রকাশ তাঁর কথায়।

তুমি কোলকাতাতেই থাকো নজরুল। রাজধানীই যে সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র-ভূমি। তুমি এখান হ'তে চলে গিয়ে সাহিত্যচর্চার এমন সুযোগ হেলায় নষ্ট কোরো না।

নিরস্ত হলেন নজরুল।

চাকুরি করা বাবু হওয়া তার সাজে না। চাকুরি শুরু করলে নজরুলের বোধ হয় নজরুল হওয়া চলত না। তাই দলিল দস্তাবেজ সইকরা কলম গ্রহণ তিনি ছাড়লেন, পরিবর্তে তুলে নিলেন "সরস্বতীর রাজদরবারে রাজপত্র সই করা সোনার বর্ণতূলিকা।"

কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা? তার কি হবে? কবি বলে ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই নাকি? টাকা কোথায়? টাকার কি ব্যবস্থা হবে?

এগিয়ে এলেন আর এক বন্ধু। মইনুদ্দিন হোসেন। মুসলমান সাহিত্য সমিতির আর একজন সহকর্মী।

তিনি তখন কোলকাতায় থাকেন না। রয়েছেন দেশের বাড়ি বীরভূম জেলার ঝাড়গ্রামে।

তা হোক, তার কাছে কিন্তু পৌঁচেছে নজরুলের আগমনবার্তা।

পাঠিয়ে দিলেন পঞ্চাশ টাকা মইনুদ্দিন হোসেন। সে যুগে এই পঞ্চাশ টাকার মূল্য যে অনেক। সহায় সম্বলহীন একজন কবির পক্ষে এ টাকার মূল্য ও প্রয়োজন যে অনেক।

নজরুল পেলেন নতুন বন্ধু মইনুদ্দিন হোসেনকে। মুজফ্‌ফর আহমদ তো আছেনই।

কিন্তু যারা পুরাণো বন্ধু!

না, তাদের ভোলা চলে না।

নজরুল চিঠি লিখে ডেকে পাঠালেন শৈলজানন্দকে, ডেকে পাঠালেন পবিত্র গাঙ্গুলিকে।

চিঠি পেয়েই পবিত্র গাঙ্গুলি হাজির হলেন কলেজ ষ্ট্রিটের মুসলমান সাহিত্য অফিসে।

উঁকি দিলেন ঘরের ভিতরে।

দেখলেন অবাক বিস্ময়েঃ একটা লোক একটা তক্তপোশের উপর বসে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, পরনে লুঙ্গি আর আটসাট একটা গেঞ্জি।

কোথায় নজরুল?

লোকটার কাছাকাছি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করার কোন মানে খুঁজে পেলেন না পবিত্র গাঙ্গুলি। চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন কোরলেন, আমি হাবিলদার সাহেবকে খুঁজছি, তিনি কি আছেন?

হাবিলদার সাহের নেই, যিনি আছেন তিনি নজরুল ইসলাম।

পবিত্র অবাক।

তুমি নজরুল?

আরে, আরে তুমি তো পবিত্র গাঙ্গুলি।

এইবার চৌকাঠ ডিঙ্গোলেন পবিত্র গাঙ্গুলি। একেবারে ঘরের মধ্যে চলে এলেন। নজরুলের খুব কাছাকাছি।

কি করে চিনলে আমাকে?

নজরুল ততক্ষণে তক্তপোশের উপর থেকে লাফিয়ে নেমে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে বুকে চেপে ধরেছেন।

আর যাকেই চিনতে যত সময়ই লাগুক না কেন পবিত্রকে চিনতে দেরী হয় না মোটেও। আসলে তুমিই তো ভাই সমস্ত সৌরভের বার্তাবহ। কোথায় সবুজ পত্র আর কোথায় জীর্ণপত্র—সর্বত্রই যে তোমায় সমান গতায়াত।

জীর্ণপত্র মানে? অবাক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

ওটা এমন কিছু নয়, জীর্ণপত্র মানে 'প্রবাসী'। আরও একটু ব্যাখ্যা করেন নজরুল প্রকৃষ্ট রূপে বাসি বলেই তো প্রবাসী।

শিশুর-সারল্য নিয়ে হেসে উঠলেন নজরুল ।

পবিত্রকে বসতে বললেন তিনি। বললেন, একটু অপেক্ষা কর, ভাই। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি। আজ খুব জাঁকিয়ে আড্ডা জমাব ।

বেরিয়ে গেলেন নজরুল ।

ভাবছেন পবিত্র, এমন না হলে আর নজরুল ইসলাম ।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন নজরুল। চা, সিঙ্গাড়া, পাতায় মোড়া পানও নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে ।

তক্তপোশের উপরেই একটা কাগজ বিছিয়ে ফেললেন নজরুল। ঠোঙা হ'তে সিঙাড়াগুলো বের করে রাখলেন তার উপরে। তারপর একটা কাঁচের গ্লাসে চা ঢেলে জিজ্ঞেস করলেন, আপত্তি নেই তো ?

কেন আপত্তি কিসের ?

নজরুল নিজের ভুল সংশোধন করে নেন ।

না, না ভাই, আমিই ভুল করেছিলাম। তুমি তো সাহিত্যিক, তোমার আপত্তি থাকবে কেন ? শৈল তো নিজেই আমার এঁটো পরিষ্কারও করে।

শৈল আবার কে ?

কেন ? শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। আমার সহপাঠী।

নজরুল বিষয়টা আরও পরিষ্কার করে দেয় পবিত্রর কাছে।

আমি করাচি হ'তে ফিরে প্রথমে তো শৈলজার মেসেই উঠেছিলাম। কেউ কিছু জানতেও পারত না। কিন্তু শৈলজা আমাকে বারবার নুরু নুরু বলে ডেকে সব ভেস্তে দিল। শেষে চাকরটা বেঁকে বসল। আমি ওর এঁটো বাসন ধোব না। ওদের রাগ গিয়ে পড়ল শৈলর উপর। সুতরাং আমি চলে এলাম এই মুজফ্‌ফর আহম্মদ সাহেবের আস্তানায় শৈলজাও মেস ছাড়ল। চলে গেল সে তার দাদামশায়ের বাড়ি বাদুর বাগান। আমার জন্যই তার এই দুর্ভোগ। খুব খারাপ লাগছে আমার।

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া।'

এখানে এসে তো নিরাপদ, নিশ্চিন্ত ?

নিশ্চয়ই। আহম্মদ সাহেবকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছি, মোসলেম ভারত পত্রিকা পেয়েছি—ভাল লাগবে না কেন ? জানিনা এর পর ভগবান আবার কোথায় নিয়ে যাবেন ?

নুরু!

সিঁড়ি দিয়ে কে যেন একজন উঠে আসছে। তারই চীৎকার, নুরু আছে?

আরে শৈল! এস, এস। অনেক দিন বাঁচবে ভাই, তোমার কথাই বলছিলাম। এস, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, আর আমার বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। যার কথা এতক্ষণ বলছিলাম। কবিতা লেখার হাত ওর খুব মিষ্টি।

পবিত্র ওদের সকলকেই আহ্বান জানালেন, এস আপাততঃ এই চা-সিঙাড়া-গুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক। ওগুলো ঠাণ্ডা করে তো কোন লাভ নেই।

বসে পড়ে শৈলজা। হাত গলায় নজরুল। ওরা তিন জনেই খেতে শুরু করে পরম আনন্দে।

শৈলজা প্রস্তাব করে, এবার গান শোনাও নজরুল।

নজরুলের আপত্তি নেই তাতে। নেই বিন্দুমাত্র ক্লান্তি।

হারমোনিয়াম টেনে নেন নজরুল। সৃষ্টি করেন সুরের মায়াজাল।

এতো শুধুমাত্র গানই নয়, প্রসুপ্ত পরিবেশকে প্রাণতপ্ততায় ভরে তুলবার একটি ধাবমান বিদ্রোহ। আগুন জ্বালা এ গান। আগুন জ্বালা এ সুর।

কিন্তু শুধু কি দহনের জ্বালাই সেখানে আছে?

তা কেন? সেখানে আছে স্নিগ্ধতার পরশ, আছে আশ্বাসবাণী আছে নতুনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠার মদিরতাও।

এল উনিশ শ' কুড়ি সাল।

তখন দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবন বইছে।

এই অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে আর একটা আন্দোলন এসে মিশেছে—সেটা খিলাফত আন্দোলন।

দেশের মানুষের কাছে দুটি মন্ত্রই তখন সার।

একটি বন্দেমাতরম্ আর অপরটি সত্যাগ্রহ।

নজরুলও তুললেন প্রতিধ্বনি :

হত্যা নয় আজ সত্যগ্রহ, শক্তির উদ্বোধন।

দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে নজরুলও তো বিভোর। এ বিভোরতা তাঁর গানে, তাঁর কবিতায়।

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন,
আসছে নবীন—জীবন হারা অসুন্দরের করতে ছেদন।
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে
মধুর হেসে --
ভেঙে আবার গড়তে জান সে চির-সুন্দর—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর ॥

নজরুলের কণ্ঠে প্রতিবাদ। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ তখন উচ্চ গ্রামে। শুধু প্রতিবাদই বা একে বলে কেন—সক্রিয় বিরুদ্ধবাদের তুলনায় কি কম কিছু?

মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশী,
আর হাতে রণ-তূর্য —

একই সূত্রে তিনি গেঁথেছেন মধুরকে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণকেও।

একদিন তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। ইংরাজদের হয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন কিন্তু তাঁর আশা ছিল অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতই: যুদ্ধে জিতলে, ভারতবর্ষের কিছু সুবিধা হবে। অন্ততঃ স্বায়ত্ব শাসনটা পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। ভারতবর্ষ যখন ইংরেজদের যুদ্ধ জয়ে সহায়তা করেছে তখন স্বায়ত্ব শাসনের সুবিধাটুকু ভারতবাসীকে না দিয়ে ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠি নিশ্চয়ই পারবে না। কিন্তু ওরা রাজের জাত। ওরা জাত বেনিয়া। ওদের অন্তর আর বাহির—এ দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান যে অনেক। মুখে যাই বলুক না কেন—আর যা বলেছিল তা তো যুদ্ধযাত্রা কালে ধনে জনে সাহায্য পাওয়ার আশা নিয়েই—এখন যুদ্ধ শেষে সে কথা রাখবার জন্য তাদের বয়েই গেছে। তাই এক হাতে স্বায়ত্ব শাসনের সুবিধা দেবার ভঙ্গি করলেও অন্যহাতে সেই সুবিধা কেড়ে নেওয়ার জন্য ওরা রইল সচেষ্ট।

হ্যাঁ, ভারতবর্ষ যুদ্ধ জয়ের বকশিস্ পেয়েছে।

রাউল্যাট আইন যুদ্ধ জয়ের পুরস্কার।

ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েকটি দমন মূলক আইনের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হল উনিশ শ' উনিশ খৃষ্টাব্দে।

প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল সারা ভারতবর্ষ।

ভারতের সর্বত্র ধর্মঘট আর সভা। সভা আর ধর্মঘট।

পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ।

রাউল্যাট আইনের প্রতিবাদে সভা ডাকা হয়েছে এখানে।

সভায় উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান-শিখ।

একজন ইংরাজ সেনাপতি—মাইকেল ও'ডায়ার-এর উপর ভার দেওয়া হল রাউল্যাট আইনের প্রতিবাদে আহূত সভা ভেঙে দিতে হবে।

হাজির হল ও'ডায়ার সভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই।

জনতাকে ছত্রভঙ্গ হ'তে আদেশ দিয়েই চালাল গুলি।

হিন্দু মুসলমান ও শিখের রক্তে সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি ভিজে গেল।

এই তো ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করে যুদ্ধ জয়ের পুবস্কার।

কিন্তু ভারতবর্ষ চুপ করে বসে থাকে নি। ভারতের সর্বত্র শুরু হল গণ-আন্দোলন। আর এই গন-আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী—মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী।

পবিত্র গাঙ্গুলি একদিন নজরুলকে বললেন সত্যেন দত্ত তোর সঙ্গে দেখা করতে চান। যাবি? কোন্ সত্যেন দত্ত? কবি? ছন্দের যাদুকর সত্যেন দত্ত।

হ্যাঁ, সেই সত্যেন দত্তই তোর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।

তিনি আমাকে জানলেন কেমন করে?

তোর কবিতা পড়ে?

কোন্ কবিতা?

কোন্ কবিতা আবার। শাত-ইল-আরব পড়ে। যেটা নোসলের ভারত বেরিয়েছে।

নজরুল উচ্ছ্বসিত।

পবিত্র আবার বলেন, সত্যেন দত্তের সঙ্গে আমার দেখা হবেই বলেন, তোমার শাত-ইল-আরবের কবিকে একদিন নিয়ে এস পবিত্র। আলাপ করি।

কোথায় গেলে তার সঙ্গে দেখা হবে।

গজেনদার আস্তানায়। জানান পবিত্র গাঙ্গুলি।

গজেনদা আবার কে? তার নাম তো শুনিনি।

পবিত্র গাঙ্গুলি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেন নজরুলের কাছে। গজেনদা হলেন গজেন চন্দ্র ঘোষ। বিলিতি সদাগরি অফিসের ক্যাশিয়ার। সদাশিব মানুষ। থাকেন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটে। ওখানেই গজেনদার বাড়ীর বৈঠকখানাতেই আড্ডা জমে।

গজেনদা সাহিত্যিক?

না, না,। সাহিত্যিক তিনি নন, তবে সমঝদার। অনেকেই ওখানে আসেন গজেনদার আকর্ষণে। সত্যেন্দ্র নাথ দত্তকেও আসতে হয়।

আরও অনেকে আসেন! বিস্ময়ে অবাক নজরুল, আর কে আসেন?

কবি করুণা নিধান, মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—সবাই আসেন।

নজরুলের চোখদুটোতে খুশির আভা ঝল্‌মল্ করে ওঠে।

তিনি রাজী।

চল, এখুনি বের হয়ে পড়ি।

সে কী রে।

আমি আর ধৈর্য্য রাখতে পারছিনা ভাই। ধৈর্য্য ধরে বসে বসে সাজগোজ করে প্রাণের ডাকে সাড়া দিতে যাব—এ আমার পোষায় না।

বেশ তো। আগে সত্যেন বাবুকে খবর দিই। তিনি কবে আসছেন। তারপর তো যাওয়া।

তুই একটু তাড়াতাড়ি কর পবিত্র।

নজরুল কেমন যেন অধৈর্য্য।

কাল ঠিক খবর নিয়ে আসব। কাল গজেনদার ওখানে সত্যেন বাবু আসবেন কি না? তাহলে হবে তো?

বেশ তাই আসিস।

পরদিন সময় মতই এলেন পবিত্র গাঙ্গুলি।

বেরিয়ে পড়লেন নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে। উদ্দেশ্যে : গজেনদার আড্ডা।

কিন্তু হা হতেস্মি।

কোথায় সত্যেন দত্ত আর কোথায় গজেনদা।

কেমন যেন বিমর্ষ পবিত্র গাঙ্গুলি।

কিন্তু নজরুল ?

তাঁর চোখে পড়েছে ঘরের কোনে স্তূপীভূত একটা কাষ্ঠপিণ্ডের দিকে।

ওটা কী পবিত্র ?

হয়তো কোন বাক্স-টাক্স হবে। কে জানে ওটা কি ?

কিন্তু নজরুলের বিশেষজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। ওটা অর্গান না হয়ে যায় না। এগিয়ে এলেন নজরুল। বাক্সটার ঢাকা খুলে দেখলেন তার অনুমানই ঠিক। কিন্তু এ কী। রিডগুলো অনড়, পেডালটাও তো টলানো দায়। তা হোক নজরুল তাকে চালু করবার শপথ নিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তারপর শুরু হল তার কেরামতি।

গজেনদা ভিতর বাড়ি হ'তে বৈঠকখানার ঘরে এসে হাজির হলেন।

পবিত্র তুমি কতক্ষণ হল এসেছ ?

নজরে পড়েছে গজেনদার ঘরের কোণে আর একজন কে যেন বসে আছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, পবিত্রকে, উনি কে ?

শাত-ইল-আরবের কবি।

শাত-ইল-আরবের কবি ওখানে বসে কী করছেন ?

গৃহস্বামীর দিকে না তাকিয়েই নজরুল উত্তর দিলেন, দেখছি এই বস্তুটাকে সরব করা যায় কিনা ?

গৃহস্বামী অবাক।

কিছু লাভ হবে না ভায়া। . ওটা পুরোপুরি কাঠ হয়ে গেছে।

কিন্তু কাঠেইতো মঞ্জরী ফোটাতে হবে।

নজরুলের এ এক পাগলামি।

পবিত্র গাঙ্গুলি গজেনদাকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যেনবাবু আজ আসছেন তো ?

আসারই তো কথা। কি জানি ? সত্যেন বোধ হয় এই কবির সঙ্গেই

আলাপ করতে চেয়েছিল ? ওর তো লেখার চেয়ে বাজনার দিকে বেশি ঝোঁক মনে হচ্ছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নজরুল সফল হলেন।

বোবা যন্ত্রটা কথা কয়েছে ততক্ষণে। নজরুল মরা কাঠের ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলেছেন সুরলহরী। অহল্যা কন্যার যেন ঘুম ভেঙ্গেছে নজরুলের স্পর্শে।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী হাজির হয়েছেন ওদের আসরে।

আরে একি ! রাতের আসরে গান ! কে বাজাচ্ছে ? আরে কী সর্বনাশ ! ওই আবর্জনার অন্তরালে—একটা রূপকথার ঝাঁপি এতকাল চাপা পড়েছিল।

সত্যই তাই। আর এই রূপকথার যাদুকর কাজী নজরুল ইসলাম।

পবিত্র গাঙ্গুলির কাছ হ'তে এতক্ষণে গজেনদা শাত-ইল-আরবের কবির নামটা জেনে নিয়েছেন।

প্রেমাঙ্কুর বললেন, একটা গান শোনাও।

আমার কণ্ঠে তো সুর নেই।

তা না থাক। ক্ষতি কি ?

নজরুল হাসলেন।

'কণ্ঠে যদি সুর না আসে করব কোলাহল।

গান শুরু করলেন নজরুল, রবীন্দ্রসঙ্গীত।

একটার পর একটা গেয়ে চলেছেন। গানে গানে সমস্ত ঘর ভরে গেছে—একটা তন্ময়তা, একটা স্তব্ধতা।

সত্যেন দত্ত ঘরে এলেন এমন সময়েই।

পবিত্র গাঙ্গুলি বললেন, সত্যেন বাবু এ-ই নজরুল ইসলাম। যার শাত-ইল-আরব আরব আপনার ভাল লেগেছে। যার সঙ্গে আপনি আলাপ করতে চেয়েছিলেন।

নজরুল অর্গান ছেড়ে উঠে এসেছেন। সত্যেন দত্তকে প্রণাম করতে যেতেই সত্যেন বাবু তাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

শুধু কি আমারই ভাল লেগেছে পবিত্র, স্বয়ং গুরুদেবেরও ভাল লেগেছে।

নজরুল বিস্ময়-বিমুগ্ধ। কথা নেই তার মুখে। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, রবীন্দ্রনাথ আমার কবিতা পড়েছেন ?

তিনি নিজেতো পড়েছেনই, আমাকেও পড়িয়েছেন। বলছেন, এ কবি বাংলা সাহিত্যে নতুন।

এই নতুন কবি সাহিত্যে এনেছেন নতুন জোয়ার।

পবিত্র খুব খুশী, রবীন্দ্রনাথ মোসলেম ভারতও পড়েন ?

সবাই পড়েন পবিত্র। যা তার হাতে আসে উল্টেপাল্টে দেখেন। আর বুঝতেও পারেন কার মধ্যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। নজরুল তুমি একদিন যেওনা তাঁর কাছে।

নজরুল অভিভূত।

পবিত্র গাঙ্গুলিই তার সহায়। তিনিই তাঁর কবিতা প্রবাসীতে প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই তো এনেছেন তাঁকে গজেনদার আড্ডায়।

প্রেমাঙ্কুর আর্তী বললেন, পরে একদিন কবির সঙ্গে দেখা কোরো। এখন আমাদের ভারতীয় আড্ডা বসবে।

গৃহস্বামী গজেনদা কিন্তু চান, নজরুল একটা গান শোনাবেন।

সত্যেন্দ্রনাথেরও সেই মত।

সুতরাং নজরুল এসে বসলেন আবার সেই অর্গানের কাছে গাইলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত।

তন্ময় সত্যেন্দ্রনাথ তন্ময় অন্যান্য সবাই।

নজরুলকে ভালবেসে ফেলেছেন ওরা।

ভালবেসেছেন দেশের মানুষও। মনেপ্রাণে।

তাকে ভাল না বেসে কি থাকা যায় ?

তিনি সাধারণ মানুষের অব্যক্ত আকাঙ্খাকেই করে তুলেছেন বাঙ্ময়। ওদের অন্তরে প্রোজ্জলিত বিদোহবহ্নিকে যে প্রকাশ করেছেন নজরুল।

ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতে এলেন।

দেশজুড়ে সেদিন ডাকা হয়েছে হরতাল।

কিন্তু সুচতুর ইংরেজ চাইল এই হরতাল বানচাল করতে। দাঙ্গা বাধাল হিন্দু মুসলমানে। সুদূর বোম্বাইয়ে হল এর সূত্রপাত। তাদের শাসন কৌশলের ফাঁদের পা দিল বোম্বাই শহর। কিন্তু কোলকাতায় সুভাষ বসুর নেতৃত্বে

ইংরেজের এ কৌশল ফেঁসে গেল কার্যকরী হল না। সারা কোলকাতা জনমানব শূন্য। কোথাও কোলাহল নেই, নেই কর্মব্যস্ততা—নিস্তব্ধ বধ্যভূমির শূন্যতা নিয়ে যেন খাঁ খাঁ করছে।

শুধু কোলকাতা কেন?

কোলকাতার বাইরেও দেখা গেল এর প্রতিক্রিয়া।

ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল—সর্বত্র হরতাল!

নজরুল তখন কুমিল্লায়।

হরতালের আবেদন জানিয়ে গান তৈরী করলেন তিনি।

তারপর?

তারপর গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে পথে পথে মিছিলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সেই গান গেয়ে গেয়ে শহর পরিভ্রমণ করলেন।

ঘরের বাহির হয়োনা আর,
ঝেড়ে ফেল হীন বোঝার ভার,
কাপুরুষ হীন মানবের মুখে
ঢাকুক লজ্জা অন্ধকার।
অন্ধকার! অন্ধকার!
নিঃশ্বাস আজি বন্ধ মা'র
অপমানে নির্মম লাজে
তাই দিকে দিকে ক্রন্দন বাজে।
দীপ নেবাও! দীপ নেবাও!
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।

নজরুল যে সৈনিক সাহিত্যিক।

তিনি তো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেন না।

বিপ্লবী বন্ধু মুজফ্ফর আহমদ আর নজরুল ইসলাম দুজনেই ঠিক করলেন একটা দৈনিক কাগজ বের করবেন। সান্ধ্য দৈনিক।

আহমদ সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি এখন কি করবেন?

কি করব মানে?

মানে অন্য কিছু নয়, শুধুই সাহিত্য করবেন না সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিও করবেন।

সাহিত্য তো কোরবই, রাজনীতিও নিশ্চয় কোরব। তবে আমার অস্ত্র কলম। এই যা প্রভেদ।

খুশী হলেন মুজফ্‌ফর আহমদ।

আমিও তো তাই চাই। আসুন আমরা একটা কাগজ বের করি। সান্ধ্য দৈনিক। দৈনিক পত্রিকা ছাড়া রাজনীতি করা অসম্ভব। প্রত্যহ সজীবতা সঞ্চার করবে সেই কাগজের পাঠকবর্গের মনের শিরা-উপশিরায়।

আমি প্রস্তুত। নজরুল জানালেন।

কিন্তু সমস্যা একটা আছে। এ সমস্যা অর্থের, এ সমস্যা প্রেসের। দৈনিক পত্রিকা বের করতে চাইলেই তো নয়। অর্থ চাই, প্রেস চাই। সেসব ওরা পাচ্ছেন কোথায়?

মুজফ্‌ফর আহমদ নতুন প্রস্তাব দিলেন, চলুন ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করি! তাঁর বহু দিনের ইচ্ছে সান্ধ্য দৈনিক বের করবেন। অথচ উপযুক্ত লোক পাচ্ছেন না। চলুন না তাঁর সঙ্গে দেখা করেই দেখা যাক।

নতুন দিনের স্বপ্নে তখন ওরা বিভোর। বিভোর মুজফ্‌ফর আহমেদ, বিভোর নজরুল ইসলামও।

তবু নজরুল জানতে চাইলেন ফজলুল হক সাহেবের সম্বন্ধে।

জানালেন মুজফ্‌ফর, তার পুরো নাম আবুল কাসেম ফজলুল হক। কোলকাতা হাইকোর্টের প্রথম সারির উকিল।

বরিশালের ফজলুল হক। প্রচণ্ড বাঙাল হলেও মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালি। তাছাড়া পয়সাওয়ালা লোক। হৃদয়ের ওদার্য্যও রয়েছে।

ধন, ডাকাত, খাল—এই নিয়ে বরিশাল। এই চলতি প্রবাদের মর্য্যাদা একমাত্র ফজলুল সাহেবই রেখেছেন। একগুঁয়ে ফজলুল সাহেবের যেমন ছিল সম্পদ প্রাচুর্য্য তেমনি ছিল হৃদয় ওদার্য্য—দুই'ই সমান। আর যে ব্যাপারে একবার গোঁ ধরতেন কর সাধ্যি তা থেকে তাঁকে এক চুলও বিরত করেন?

ফজলুল হক সাহেব মুজফ্‌ফরকে আগে থেকেই জানতেন। তাঁর ক্ষমতা ও কর্মশক্তি সম্পর্কে তিনি সচেতনও। তাই মুজফ্‌ফর সাহেবের কাছ হতে যখন কাগজ বের করার প্রস্তাব পেলেন তখন সানন্দেই রাজী হলেন।

কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগল তার মনে।

সংবাদ প্রচারের বাহন হিসেবে কাজ করাই তো শুধু পত্রিকার লক্ষ্য নয়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধও চাই। আর এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধই তো কাগজের মূল্যায়ন করবার মাপকাঠি। কাগজের আয়ু নির্দ্ধারণ করে এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধই!

সুতরাং?

উপদেশ দিলেন হকসাহেব, তোমরা বরং আমার একটা যুক্তি শোন, পাঁচকড়ি বাঁড়ুয্যেকে দিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা লিখিয়ে নাও। টাকা অবশ্যই এর জন্য কিছু বেশী খরচ হবে—তা হয় হোক্ সে টাকা আমিই দিয়ে দেবো।

মুজফ্ফর কিন্তু রাজী নন ফজলুল হক সাহেবের এ প্রস্তাব মানতে। তাঁর বক্তব্য ওসব যা করার আমরাই কোরব। কাগজ প্রকাশনার ব্যাপারে আমরা বাইরের কারোর সাহায্য নেব না।

কিন্তু তোমাদের লেখা পড়বে কে? হক সাহেবের অখণ্ড যুক্তি। পাঁচকড়ির লেখায় ধার আছে। পাঁচকড়ি বাঁড়ুয্যে সম্পাদকীয় লিখছে জানতে পারলেই সাধারণ মানুষ কাগজ কিনবেই। কাগজটা যদি চালাতেই চাও তাহলে অবশ্য এ তোমাদের করতেই হবে।

তবু মুজফ্ফর আহমেদের অকাট্য যুক্তি।

আমরা যে কাগজ বের করব তার একটা নীতি রইবে, রইবে একটা আদর্শ। কিন্তু পাঁচকড়ি বাবুর লেখায় ধার রইলেও তার কোন নীতি জ্ঞান নেই। এখন কথা বলেন পরক্ষণে ভিন্ন কথা বলার জুড়ি পাঁচকড়ি বাবুর মতো নেই।

ফজলুল হক ওদের নীতি সম্পর্কে এর আগে আদৌ কোন প্রশ্ন তোলেন নি। এখন জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের নীতিটা কি শুনি।

কিছুটা যেন ফজলুল হক সাহেব অসহিষ্ণু!

কৃষক শ্রমিকের দাবি তুলে ধরাই আমাদের নীতি, আমাদের লক্ষ্য—আর পরাধীনতার বন্ধন মোচনে আমাদের একটা বিশেষ ভূমিকা যে রইবে তা কোন প্রশ্নেরই অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু ল্যাখপে কেডা?

হক সাহেব ফেটে পড়লেন।

নজরুল ইসলাম লিখবে!

সে আবার কে?

হক সাহেব অবাক।

কৈ এর আগে তো তিনি কোনদিন এ নাম শোনেন নি। কোন কাগজ চালান তিনি ?

না, কোন কাগজের সম্পাদনা করার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। নাই বা রইল। তবু নজরুল ইসলাম তার সঙ্গে আছেন এই ভরসাতেই মুজক্‌ফর আহমদ বললেন, বেশ পরে একদিন দুটো প্রবন্ধের নমুনা নিয়ে আপনার সঙ্গে আবার দেখা করছি।

মনটা খুঁত খুঁত করলেও শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাবে আর হকসাহেব না করতে পারেন না।

নজরুলের উপর দায়িত্ব দিলেন আহমদ সাহেব।

দু'টো প্রবন্ধ লিখে ফেলুন। একটা সাধু ভাষায়—একটা কথ্য ভাষায়

নজরুল প্রবন্ধ দুটো লিখলেন। দেখালেন আহমদ সাহেবকে।

পড়তে পড়তে চক্ চক্ করে উঠল আহমদ সাহেবের চোখ। তাঁর খুব ভাল লেগেছে প্রবন্ধ দুটোই। এখন হক সাহেবের পছন্দ হলেই হয়। তাঁরই অর্থানুকুল্যে যখন পত্রিকা প্রকাশিত হবে তখন তাঁর পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর খানিকটা ওদের করতেই হবে। এ ছাড়া আর গত্যন্তরই বা কী !

নজরুল বললেন, চলুন আমি নিজে গিয়ে পড়ে শুনিয়ে আসি প্রবন্ধ দুটো হক সাহেবকে।

নজরুল পড়ে শোনালেন।

হক সাহেবের ভাল লাগলেও খানিকটা পাঁচকড়ির প্রতি টান ছিলই।

মুজক্‌ফর বললেন, তাহলে কিন্তু আমরা আপনার কাগজের জন্য বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করতে পারব না।

অগত্যা রাজী হতে হল ফজলুল হক সাহেবকে !

দেখাই যাক্ মা এদের দৌড়ই বা কতটুকু !

এবার প্রশ্ন উঠল, পত্রিকার নাম কি রাখা যায়।

চলল বাক্ বিতণ্ডা। ওটা হিন্দু নাম। ওটা মুসলমান নাম নয়। একটা মুসলমানি নাম রাখা যাক। এমনি ধারা নানা রূপ জল্পনা-কল্পনা, কথা কাটাকাটির শেষে স্থির হল পত্রিকার নাম রাখা হবে, 'নবযুগ'।

বিপ্লবী জনগনের আগামী দিনের যে যুগ সে যুগই তো 'নবযুগ'। আর তাদের প্রকাশিত পত্রিকাতেই হবে তার সূত্রপাত।

নামের সমস্যা শেষ পর্যন্ত মিটল।

এবারে প্রেস।

হক সাহেবের নিজস্ব একটা প্রেস আছে।

কিন্তু ওটা কি প্রেস?

না আছে টাইপ, না আছে কেস, আর মেসিন যেটা আছে সেটা ভগ্নদেহ কোন রকমে আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

মুজফ্‌ফর আহমদের তো চক্ষুস্থির।

তা হোক!

ওটার সাহায্যেই আপাততঃ কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া পত্রিকার স্বার্থে শেষ পর্যন্ত হক সাহেব নিশ্চয়ই প্রেসের জন্য টাকা খরচ করবেনই।

প্রাণান্তরকর প্রচেষ্টা চালালেন মুজফ্‌ফর আহমদ।

প্রাণান্তকর পরিশ্রম করলেন সৈনিক—কবি নজরুল ইসলাম।

প্রকাশিত হল নবযুগ। একেবারে নন্‌-কো-অপারেশনের যুগেই, অসহযোগ আন্দোলন চলছে তখন দেশ জুড়ে। ব্রিটিশ সরকারও কম যায় না। নিষেধাজ্ঞা! নিষেধাজ্ঞা! বক্তৃতা দেওয়া চলবে না, সভা করা চলবেনা। নিষেধাজ্ঞা জারি হল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের! চমৎকার! সাবাস ব্রিটিশ-শাসক।

নজরুল সম্পাদকীয় লিখলেন:

উপর, একই নিষেধাজ্ঞা শেরওয়ালীর উপরও। শুধু নিষেধের সঙিন উঁচিয়ে ওরা ওদের ক্ষমতার অহঙ্কারের পরিচয় দিতে চাইল।

"খুব সোজা করিয়া বলিতে গেলে নন-কো-অপারেশান হইতেছে বিছুটি বা আলকুসি এবং আমলাতন্ত্র হইতেছেন ছাগল। ছাগলের গায়ে বিছুটি লাগিলে যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে, এই আমলাতন্ত্রও তেমন অসহযোগিতা বিছুটির জ্বালায় বেসামাল হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিছুতেই যখন জ্বলন ঠাণ্ডা হয় না তখন ছাগ বেচারী জলে গিয়া লাফাইয়া পড়ে,

দেওয়ালে গা ঘসিতে থাকে, উলটো ঘসাঘসির চোটে তাহার চামড়াটি দিব্যি ক্ষৌরকর্ম করার মতই লোম শূন্য হইয়া যায়। আমলাতন্ত্রের গায়েও বিছুটি লাগিয়াছে এবং তাই তিনি কখনো জলে নামিতেছেন, কখনো ঢাঙায় ছুটিতেছেন। আর কখনো বা দেওয়ালে গা ঘেঁসড়াইয়া খামকা নিজেরই নুনছাল তুলিতেছেন। তবু কিন্তু জ্বলন থামিতেছে না, বরং ক্রমেই বাড়িতেছে।...তাঁহারা সে সব বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন তাহার সকলগুলির পরিচয় দিতে হইলে একটি মস্তকাণ্ড 'আমলায়ণ' লিখিতে হয়। তবে সব চেয়ে ঝাঁঝালো বুদ্ধিটা দেখাইতেছেন যাহার-তাহার যে কোনো সময়ে সটান মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া।...

জোর জবরদস্তি করিয়া কি কখনও সচেতন জাগ্রত জন—সজ্যকে চুপ করানো যায়? বালির বাঁধ দিয়া কি দামোদরের স্রোত আটকানো যায়? যতদিন ঘুমাইয়া ছিলাম বা কিছু বুঝি নাই ততদিন যাহা করিয়াছ সাজিয়াছে। এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ, এখনও কি আর ওরকম ছেলেমানুষী চলিবে মনে কর? আমাদের বড় ভয় হয়, এ মুখবন্ধ আমাদের নয়, তোমাদের। আশাকরি আমাদের এ ভয় মিথ্যা হইবে না।..."

না, ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর সাধ্য হয়নি নজরুলের রচনাকে রাজদ্রোহিতার লেবেল আঁটকে দিয়ে বরখাস্ত করে দেওয়ার। রাজদ্রোহ নয় অথচ প্রাণের আর্তি, মনের কথা প্রকাশ করে চললেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি যেন এ ব্যাপারেও সিদ্ধহস্ত।

ও-ডায়ারের নৃশংসতার কথা লিখতে গিয়েও নজরুল 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভে' ফুটিয়ে তুললেন তাঁর সেই একই আর্তি।

"...এই ডায়ারের মত দুর্দান্ত কশাই সেনানী যদি সেদিন আমাদিগকে কুকুরের মত করিয়া না মারিত, তাহা হইলে কি আজিকার মত আমাদের এই হিম নিরেট প্রাণ ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত—না, আমাদের আহত আত্ম-সম্মান এমন দলিত সর্পের মত গর্জিয়া উঠিতে পারিত? কখনই না। আজ আমাদের সত্যিকার শোচনীয় অবস্থা সাদা চোখে দেখিতে পারিয়াছি এই ডায়ারেরই জন্য। ডায়ারই আমাদের অন্ধত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছেন। অন্য প্রতারকদের মত গলায় পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া তাদের দেখাইতে যায় নাই -সে নারীর সামনে উলঙ্গ করিয়া বেত্র দিয়া তোমার পিঠের চামড়া তুলিয়াছে। গর্দানে পাথর চাপা দিয়ে বুকের উপর হাঁটাইয়াছে, তাহাদের পায়ে তোমাদিগকে সিজদ

বা সাষ্টাঙ্গ করাইয়া ছাড়িয়াছে। তোমাদিগকে জাগাইতে চাই এমনি প্রচণ্ড নির্মম কশাই শক্তি।...ডায়ারের বুট এমন করিয়া তোমাদের কলিজা মথিত না করিয়া গেলে তোমাদের চেতনা হইত না। তোমাদের মুখের সামনে তোমাদের আত্মীয় আত্মীয়ার মুখে এমনি করিয়া থুথু না দিলে তোমাদের মানব শক্তি ক্ষ্যেপিয়া উঠিত না। তাই আজ আমরা ডায়ারকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেছি, খোদা তোমার মঙ্গল করুণ।...নিশ্চয়ই তুলিব তোমার স্মৃতিস্তম্ভ, মহৎ প্রতিহিংসা রূপে নয়, প্রতিদান স্বরূপে। আজ আমাদের এ মিলনের দিনে তোমাকে ভুলিতে তো পারিব না ভাই। এই মহামানবের সাগরতীরে ভারতবাসী জাগিয়াছে—বড় সুন্দর মোহন মূর্তিতে জাগিয়াছে সেই তোমার আনন্দের হত্যার দিনে, সেই জালিয়ানওয়ালবাগের হাতভাগাদের রক্তের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দু মুসলমান দুই ভাই গলাগলি করিয়া কাঁদিয়াছে।...কাঁদিয়াছি—গলা জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিয়াছি—আমাদের ভাইদের খুন-মাখানো সমাধির উপর দাঁড়াইয়া আমরা এক ভাই অন্য ভাইকে চিনিয়াছি, আর বড় প্রাণ ভরিয়া গাহিয়াছি—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
এমন ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।

আজ এস ডায়ার, আমাদের এই মহামিলনের পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া যাও”

টনক নড়ল ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর।

'নবযুগ' সত্যই তখন নিয়ে এসেছে যুগান্তর। ঘুম ভেঙেছে অনেক দঁদে বিটিশ শাসকেরই।

তা না হলে হাইকোর্টের জর্জ মিঃ টিউনন যেদিন ফজফুল হক সাহেবকে তার খাস কামরাতে ডেকে পাঠাবেনই বা কেন?

ঘরে ঢুকেই ব্যাপারটা ফজলুল হক সাহেবের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

মিঃ টিউননের টেবিলে একটা নবযুগ।

ফজলুল হক জানতেন মিঃ টিউনন বাংলা জানেন কিন্তু তিনি যে শেষ পর্যন্ত নবযুগও পড়বেন তা ভাবেন নি। অবাক হলেন ফজলুল হক। খুশীও কম

নন। তিনি এটুকু বুঝতে পেরেছেন অত্যন্ত অনায়াসেই নবযুগ ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর তার কারণ অনুসন্ধান করতেই সেই নবযুগ এখন টিউননের টেবিলে।

বলুন, আমাকে ডেকেছেন কেন ?

নবযুগ সম্বন্ধে বলব বলেই ডেকেছি।

বেশ তো, বলুন না, কি বলবেন ?

মিঃ টিউনন বললেন, নবযুগের লেখাগুলো খুব উত্তেজনা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে না ? এতটা বোধহয় ভাল নয়। মনে হচ্ছে একটু যেন ওরা বাড়াবাড়িই করে ফেলছে। আপনি কি বলেন মিঃ হক।

আমি তো এতদূর ভেবে দেখিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এ ব্যাপারে সম্পাদকদের বলব।

খুশী হলেন মিঃ টিউনন ফজলুল হকের আশ্বাসে।

আর আরও খুশী হয়ে ফিরে এলেন ফজলুল হক সাহেব। হবেনই বা না কেন ? মূল উদ্দেশ্য যখন সফল হচ্ছে তখন তার খুশী হওয়াই তো উচিত। ইংরেজদের টনক নড়েছে এ কী কম কথা !

ডেকে পাঠালেন সম্পাদকদের।

এলেন মুজফ্‌ফর আহমদ, এলেন নজরুল ইসলাম।

মিঃ টিউননের কথাগুলো ওদের কাছে বললেন ফজলুল হক। তারপর একেবারে খুশীতে ভেঙে পড়ে বললেন, লিখে যাও। থামিও না তোমাদের কলম। বেটাদের টনক নড়িয়ে দিতেই হ'বে।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। অথচ তুরস্কের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হল না। স্বাভাবিক ভাবেই একদল ভারতীয় মুসলমানের মনে জাগল ক্ষোভ। সুতরাং ব্রিটিশ-ভারতে বসবাস করার আর কোন যুক্তি নেই। অতএব তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের নির্বাসিত করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ওরা চলে যেতে চাইলেন আফগানিস্থানে। ভারতে আর থাকবেন না। অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজত্বে বাস করা তাদের কাছে আজ যুক্তিহীন। সুতরাং ওরা রওনা দিলেন। ছেড়ে এলেন, সিন্ধু, ছেড়ে এলেন সীমান্ত প্রদেশ। অভিমানী ওরা কিন্তু ওরা অস্ত্রহীন ওরা শান্ত, নিরুপদ্রব।

কিন্তু আফগানিস্থান একটা চল্লিশ জনের দলকে ফেরৎ পাঠাল। এবারে

বাধা দিল ব্রিটিশ সরকার। ওদের যেতে দেওয়া হবে না। শুনলে না ওরা। ব্রিটিশ সরকারের বাধা ওরা মানেন না—মানবেন না।

সুতরাং ফল দাঁড়াল মারাত্মক।

ব্রিটিশ পুলিস চালাল গুলি।

মারা গেলেন নিরীহ কতকগুলি মানুষ।

কিন্তু কী অপরাধ ওদের? ওরা স্বজন পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হ'তে চেয়েছিলেন—এই কী তাদের মস্ত বড় অপরাধ?

নজরুল লিখলেন: মুহাজিরিন (স্বেচ্ছা নির্বাসিতদের) হত্যার দায়ী কে?

"...কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া-খাইয়া অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে খুন কর, আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠা-কাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পারিব না?

এই অত্যাচারের, এই মিথ্যার বনিয়াদে খাড়া করা তোমাদের ঘর—মনে কর কি চিরদিন খাড়া থাকিবে?

তোমাদের জুলুমে নিপীড়িত হইয়া মানবাত্মার এত পাশবিক অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া মানুষের মত যাহারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারিল যে, এখানে আর ধর্ম কর্ম চলিবেনা, এবং চিরদিনের মত তোমাদের সংস্রব ছাড়িয়া সালাম করিয়া বিদায় লইল, সেই বিদায়ের দিনে তাকে হত্যা করিলে, আবার হত্যা করিলে আমাদের ভারতীয় সৈন্য দ্বারা। যাহাকে হত্যা করিলে তাহাকে হত্যা করিয়াও ছাড় নাই। তাহার লাশ তিনদিন ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়া পচাইয়া গলাইয়া ছাড়িয়াছে! মৃতের প্রতিও এত আক্রোশ এত অসম্মান কেবল তোমাদের মত সভ্য জাতিই একা দেখাইতে পারিতেছে! তোমাদের কিচনার—লর্ড কিচনার মেহেদীর কবর হইতে অস্থি উত্তোলন করিয়া ঘোড়ার পায়ে বাঁধিয়া ঘোড়দৌড় করিয়াছে, তোমাদের এই সৈন্যদল যে তাহারই শিষ্য। না জানি আরো কত বাছাদের, আমাদের কত মা-বোনদের খুলি উড়াইয়াছ, তোমরাই জান! আমাদের যে ভাই আজ তোমাদের হাতে শহীদ হইল সে এমন এক মুক্ত স্বাধীন দেশে গিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে তোমাদের গুলি পৌঁছুতে

পারেনা। সে যে মুক্তির সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল। মনে রাখিও সে খোদার আরশের পায়া ধরিয়া ইহার দাদ মাগিতেছে। দাও উত্তর দাও। বল তোমার কি বলিবার আছে।'

ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর উত্তর দেওয়ার উত্তর সেদিন জানা ছিল না। কিন্তু ওরা যে শাসক মহল তার পরিচয় দিতে কসুর করবেন কেন?

অতএব বাজেয়াপ্ত কর নবযুগের জামানত।

নবযুগের জামানত বাজেয়াপ্ত হল।

জামিনের টাকা জব্দ হয়েছে কিন্তু এতে কিছুমাত্র দুঃখ নেই নজরুলের। দৈনিক কাগজের ছকে বাধা কাজকর্মে কেমন যেন তাঁর একটা একঘেয়েমি এসেছিল। একটা বিশেষ সূত্রে বাঁধা থাকায় বারবার তার কেমন যেন বিরক্তি এসে গিয়েছিল। আপন প্রাণসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত স্ফূর্তির সুযোগ না দেখে। সময়ের সঙ্গে পা মেপে মেপে চলতে তিনি তখন বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

মুজফ্‌ফর আহম্মদকে নজরুল বললেন, এবার তাহলে আমার ছুটি।

বন্ধন মুক্তির আনন্দে উদ্বেল নজরুল।

না, না, ছুটি কোথায়? ছুটি নেই। আবার তো নতুন করে জমানতের টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। নবযুগের প্রকাশ বন্ধ হবে না—বন্ধ হতে পারে না।

নজরুল হাসলেন, নবযুগ কি কখনও বন্ধ হতে পারে? কিন্তু আমি যে বন্দী হয়ে গেছি আমার ছুটি চাই-ই চাই।

কি করবেন এখন?

চেঞ্জে যাব।

চেঞ্জে যাবেন? অবাক মুজফ্‌ফর।

হ্যাঁ, বাইরেই যাব আমি। আমাকে যেতেই হবে। এ বন্ধনে আমায় প্রাণ বড় অবাধ্য হয়ে পড়েছে।

কোথায় টার্ণার ষ্ট্রিট আর কোথায় দেওঘর!

বাসাবদলের উত্তেজনায় উত্তপ্ত নজরুল যেন অবাধ্য প্রাণ।

শৈলজার মেস ছেড়ে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে ৩২ কলেজ ষ্ট্রিটে এসেছিলেন। কিন্তু কতদিন আর সেখানে রইলেন? অল্পকালই।

চলে এলেন কলেজ ষ্ট্রীট থেকে মার্কুইস লেনে আর সেখান থেকে একেবারে টার্ণার ষ্ট্রীট—নবযুগের অফিসে। আর তার পর আজ যখন নবযুগের জামানত জব্দ হয়ে গেল তখন কেন আর মিছামিছি টার্ণার ষ্ট্রীটে পড়ে থাকা? কোন যুক্তি নেই। নেই কোন সার্থকতা।

এই হাওয়া বদলের অজুহাতে বাসা বদল করলেন নজরুল।

একেবারে কোলকাতা থেকে দেওঘরে।

দেওঘরে পৌছেই একটা বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হ'তে হল তাঁকে। যে বাসাবদলের হাওয়ার টানে ছুটে এলেন দেওঘরে সেখানে বাসা পাওয়াই একটা বিরাট দায় হয়ে উঠল তাঁর কাছে।

কোথায় যাবেন কিছুই জানেন না, চেনেন না কোনও কিছুই। আত্মীয় স্বজনও নেই এখানে।

তার উপরে আরও মহা বিপদ।

ষ্টেশনে পা দিয়েই পাণ্ডা মহারাজদের খপ্পরে পড়লেন।

প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত। যতই তিনি বোঝবার চেষ্টা করেন তিন হিন্দু নন, তীর্থ যাত্রীর পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনা নিয়ে তিনি এখানে আসেননি। ততই ওরা ছেঁকে ধরে। শেষ পর্য্যন্ত সুটকেশ খুলে মুসলমানী পোষাক পরে তবে তিনি রেহাই পেলেন পাণ্ডাদের হাত থেকে।

তা তো হল। এখন যাবেন কোথায়?

মনে পড়ল তাঁর বারীন ঘোষের কথা।

'ভাঙা বাঙ্গালার রাঙ্গা যুগের আদি পুরোহিত।'

বারীন ঘোষের দাদামশাই রাজনারায়ণ বসু দেওঘরেই থাকেন। তাঁকে চেনেও সবাই। অতএব নজরুল ঠিক করলেন ওখানেই যাবেন।

রাজনারায়ণ বসুকে নজরুল সব কথা খুলে বলবেন। খুলে বলবেন তাঁর বর্তমানের বাসা সমস্যার কথা। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা একটা হবেই।

অতএব চল সেখানে।

ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত হলও।

ডাক্তার কার্তিক বসুর স্যানাটোরিয়ামে জায়গা পেলেন নজরুল। দু'কামরার একটা কটেজ। ভাড়াও খুব অল্প। কারণ যাত্রী আসার মরসুম সেটা নয়। নজরুল মহা খুশী।

দেখাশুনা করার জন্য, ফাইফরমাশ খাটার জন্য একটা ছোকরা চাকরও জুটে গেল। আবদুল। সুতরাং রাজকীয় ব্যবস্থা। এবার নিশ্চিন্তে বিশ্রাম।

বিশ্রাম আর কবিতা।

কবিতা আর বিশ্রাম।

কিন্তু অখণ্ড অবকাশ বুঝি ভাল লাগে না। মনটা যেন কোলকাতার জন্য কেমন কেমন করে। হাতে টাকা পয়সাও নেই। আফজলের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন নজরুল, কবিতার জন্য লেখার জন্য তাগিদ। কিন্তু টাকা? টাকা তো বিদেশে প্রয়োজন।

অথচ 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার আফজালুল হক সংক্ষেপে আফজলের প্রেরণাতেই তো নজরুলের দেওঘর যাত্রা। অবশ্য আরও একজন তাকে দেওঘর যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন তিনি আলি আকবর। ওদের ধারণা মুজফ্‌ফরের রাজনৈতিক পত্রিকা নজরুলের স্বাভাবিক বিকাশে পথের অন্তরায়। সুতরাং সার্বভৌম সাহিত্যের ক্ষতি করা চলে না। ওই রাজনৈতিক আবহাওয়ার নজরুলকে আচ্ছন্ন করে রাখা চলবে না। সুতরাং নিজেদের স্বার্থটাকে বজায় রাখতে অর্থাৎ শিশুপাঠ্য বইগুলোর চহিদা বাড়াতে ব্যবহার করবেন নজরুল—এ আশা নিয়েই নজরুলকে মুজফ্‌ফরের ত্রিসীমানার বাইরে নিয়ে এলেন।

কিন্তু এখন একেবারে চুপচাপ।

দুঃখ পেলেন নজরুল।

এ দুঃখ তিনি কাকে জানাবেন?

একমাত্র পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কেই বুঝি নজরুল জানাতে পারেন। অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছাড়া এ দুঃখ আর কে বুঝবে?

তিনি লিখলেন:

'টাকা ফুরিয়ে গেছে। আফজল কিম্বা খাঁ যেন শিগগির টাকা পাঠায়। খোঁজ নিবি আর বলবি আমার মাঝে মানুষের রক্ত আছে। আজ যদি তারা সাহায্য করে, তা ব্যর্থ হবে না—আমি তা সুদে আসলে পুরে দেব।'

কিন্তু কোথায় টাকা?

কবিতা লেখাও আর হয়ে ওঠে না ছাই।

একদিন সন্ধ্যার পর নজরুল একাকী বসে আছেন। ভাবছেন কি করবেন? ভেবে ঠিক কুল-কিনারা পাচ্ছেন না।

কারা যেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে বাবু।

আবদুলের কাছ হ'তে এ খবর পেয়ে নজরুল অবাক। কারা এল? কারও আসার কোন কথা তো ছিল না। পবিত্র? শৈল? না তা হ'তে পারে না। ওরা এলে নিশ্চয়ই খবর দিয়েই আসবে। নানা সম্ভব অসম্ভব ভাবনা ভাবতে ভাবতেই তিনি বাইরে এলেন। অবাক তিনি, এক জোড়া তরুণ-তরুণী। কিন্তু এদের কোথায় দেখেছেন তিনি? কিছুতেই মনে করতে পারলেন না।

তাই দ্বিধা, সংকোচ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আপনাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না। কোথাও দেখছি কিনা ঠিক মনে করতে পারছি না। হয়তো বা আমারই ভুল হচ্ছে।

না, না আপনার কোন ভুল হয়নি! আমাদের আপনি চেনেন না। তবে ভীষণ বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি। দেওঘরে এসে কোথাও আশ্রয় পাচ্ছি না। শুনেছি আপনার একটা খালি ঘর আছে। আমাদের একটু আশ্রয় দিন না। মিনতিতে ভেঙ্গে পড়ে তরুণটি।

আশ্রয়? অবাক চোখ মেলে তাকান নজরুল ওদের মুখের দিকে।

হ্যাঁ আশ্রয়। শুধু এই রাত্রিটার মতই। কাল ভোরেই আমরা চলে যাব।

মেয়েটির চোখের দিকে তাকালেন নজরুল। মিনতিভরা ওচোখ দু'টো।

নজরুলের মনে হল তিনি ওদের চেনেন। সেই কোন অনাদিকাল হতেই যেন ওরা ভেসে আসছে যুগল প্রেমের স্রোতে।

বেশতো থাকুন।

না, কোন প্রশ্ন নয়। নজরুলের প্রশ্ন মনে পড়ে নি। তাঁর নিজের যেমন অন্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ছিল না তেমনি তিনি নিজেও একবারও ভাবেননি তাকে হয়তো বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হবে।

ওরা অবশ্য পরদিন ভোরেই চলে গিয়েছিল।

কিন্তু নজরুল পড়লেন বিপদে।

খবর তখন রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেওঘরের সর্বত্রই।

রাজসাহি থেকে যে ছেলে আর মেয়েটা পালিয়ে এসেছে তাদের আশ্রয় দিয়েছেন নজরুল ইসলাম।

নজরুলের বক্তব্য: আমি প্রেম জেনেই ওদের আশ্রয় দিয়েছি, পাপ জেনে নয়।

কিন্তু নজরুলের কথা শোনে কে ?

নোটিশ এল বাড়িওয়ালার তরফ থেকে, ঘর ছাড়তে হবে এবার। দেওঘরের বাসে ইতি টানতেই হবে এবার।

মুজফ্ফর আহমদ জানতে পেরেছেন নজরুলের এই দুর্দশার কথা।

অতএব কোন প্রশ্ন নয়, নয় কোন দ্বিধা। তিনি সোজা হাজির হলেন দেওঘরে।

দেওঘরে পৌঁছে ঘরের চেহারা দেখেই বুঝে নিয়েছেন তিনি সব ব্যাপারটাই। এমন হা ঘরে চেহারা হওয়ার কারণ খুঁজে পেতে তার আর কোন অসুবিধাই নেই।

খুব চেঞ্জ হল, এবার কলকাতায় চলুন।

হ্যাঁ তাই যাব। আমিও প্রস্তুত। আমি যে আপনারই পথ চেয়ে ছিলাম।

নজরুল রওনা হলেন মুজফ্ফরের সঙ্গে, সঙ্গে এল আবদুলও।

নজরুল মুজফ্ফরের সঙ্গে চলে এলেন চেতলা হাট রোডের বাড়ীতে।

কোলকাতায় এলেন নজরুল।

যোগ দিলেন আবার 'নবযুগে'। যদিও তখন মুজফ্ফরের সঙ্গে নবযুগের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

এ ছাড়া উপায়ই বা কী ?

তাকে তো উদর পূরণের সংস্থান করতেই হবে। করতেই হবে টাকা রোজগারের ব্যবস্থা।

মুজফ্ফর অবশ্য ভাবেননি, যে নবযুগ এখন প্রাণ থেকে প্রস্তরে রূপান্তরিত হয়েছে, যে নবযুগের এখন আর বিন্দু মাত্র নীতির বালাই নেই সেই প্রতিক্রিয়াশীল কাগজে নজরুল যোগ দেবেন।

আসলে প্রোগেসিভই বা কোনটি আর কোনটিই বা রিয়্যাকশানারি অতসব সাতপাঁচ ভাববার অবসর নজরুলের কোথায় ? তিনি লিখবেন এটুকুই

জানেন। লেখাইটাই তার আসল লক্ষ্য আর লেখাটা হ'বে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। অতসব ন্যায় নীতির কচকচির মধ্যে মাথা গলিয়ে তার লাভ ?

নজরুল লিখতে শুরু করলেন।

নজরুল মানেই নবযুগের কাট্‌তি। একেবারে ঝড়ের বেগে।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের নজর এড়ানো যায় না।

একবার, দুবার তিনবার সাবধান করা হল নবযুগের কর্তৃপক্ষকে সরকারের তরফ থেকে।

অতএব 'নবযুগে' লেখার কাজটা শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না।

ছেড়ে দিতে হল তাকে নবযুগ।

নাইবা থাকল নবযুগ। তাতে নজরুলের কী আসে যায় ?

তইন তিনি ডাক শুনছেন আলি আকবরের কাছ হ'তে। যেতে হবে কুমিল্লা – দৌলতপুর।

মুজফ্‌ফর জানতে পারলেন সে কথা। খুশীমনে মেনে নিতে পারলেন না মুজফ্‌ফর। আসলে এই আলি আকবরের উপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই মুজফ্‌ফরের। এদিকে নজরুল তো আলি আকবরের আহ্বানে একেবারে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। যাওয়ার জন্য ভীষণ ভাবে প্রস্তুত। হয়তো বা শেষ পর্যন্ত নজরুল আলি আকবরের শিকার হয়ে পড়বেন।

আলি আকবর নজরুল ইসলামের কাছে এসেছিলেন তার শিশুপাঠ্য বইয়ের প্রকাশের জন্য একটা কবিতার আশায়।

নজরুল বিরক্ত হন নি, মায়া হয়েছিল আলি আকবরের উপর। তাছাড়া আর কী ? আলি আকবর শিশুপাঠ্য কবিতা লিখতেন কিন্তু সে যে কি কবিতা বোঝা যায় না।

নজরুল একটা কবিতা লিখে দিলেন আলি আকবরকে :

বাবুদের তাল পুকুরে
হাবুদের ডাল কুকুরে
সে কি বাস করল, তাড়া—

আলি আকবর খুব খুশী।

আপনার ছোটদের জন্য কবিতা লেখার হাত খুব ভাল। এবার বিষয়বুদ্ধি

সম্পন্ন আলি আকবর হেসে বললেন, বড়দের জন্য যে কবিতা লেখেন তা আর বাজারে কত কাটবে? আপনি বরং ছোটদের জন্যই লিখুন—দেখবেন হু হু করে বাজারে কেটে যাবে।

নজরুল উত্তর দেন না। শুধু হাসেন।

তিনি তো জানেন ছোটদের ভালবাসেন বলেই ছোটদের জন্য কবিতা লেখা। ওসব লাভ-লোকসান, হিসেব-নিকেশ করে লাভ নেই কবির।

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনা মুখ খুকুরে,
আলু থালু ঘুম যাও রোদ-গলা দুকুরে।
প্রজাপতি ডেকে যায়,
বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়,
আসমানে তারা চায়
চলে আয় এ অকূল
ঝিঙে ফুল।

আলি আকবর অনুরোধ জানালেন নজরুলকে:

চলুন আমাদের দেশে নদী আর মাঠের রাজ্য পূর্ববঙ্গ আপনার ভালই লাগবে। বেশ খোলামেলা পরিবেশের মধ্যে থেকে দিব্যি ছোটদের জন্য কবিতা রচনা করতে পারবেন। আসলে অন্তরে তো আপনি শিশু বৈ নন।

নজরুল হাসলেন। সম্মতির হাসি।

তবে সঙ্গে কিন্তু আপনার বাঁশিটা নিয়ে যাবেন।

কেন! কি হবে বাঁশি?

নার্গিস বাঁশি শুনতে খুব ভালবাসে।

নার্গিস? সে আবার কে?

কেন? আমার ভাগ্নি। ওখানে গেলেই দেখতে পাবেন, আলাপও হবে। খুব ভাল মেয়ে।

নজরুল রাজী। নজরুল সম্মতি জানালেন। কিন্তু মুজফ্‌ফর সায় দিতে পারেন না নজরুলের এই স্বীকৃতিতে। আসলে মুজফ্‌ফরের স্পষ্ট বক্তব্য ছোটদের জন্য কবিতা লেখার পরিবেশের খোঁজে আলি আকবরের দেশের বাড়ী যাওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়?

মুজফ্‌ফরের মনে সম্ভাবনা জাগে।

কি জানি আলি আকবর আবার নজরুলকে বিপদে ফেলবে না তো? ও সব করতে পারে। যদি কোন দুরভিসন্ধি থাকে নজরুলকে দেশের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার পশ্চাতে। সান্ত্বনা দিতে পারেন না কিছুতেই নিজেকে।

যদি কোন বিপদে পড়তে হয়?

বিপদ! নজরুল হাসেন মুফ্‌ফরের প্রশ্নের উত্তরে।

আসলে বিপদকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার জন্যই যেন নজরুল। দুঃখ তাকে পেতেই হবে। দুঃখ মন্থনেইতো উঠে আসবে সুখ-অমৃত। আঘাতে আঘাতেই তো প্রস্তর ভেদ করে ছুটে আসবে নির্ঝরিনীর প্রবাহ।

অতএব আর কোন প্রশ্ন নয়। নয় কোন জিজ্ঞাসা।

আলি আকবরের সঙ্গে সঙ্গে নজরুল রওনা হয়ে গেলেন দৌলত পুর।

পথে পড়ল কুমিল্লা।

এখানে একবার ওরা নামবেন।

না, নজরুলের কোন পরিচিত আত্মীয় নেই এখানে। আসলে আলি আকবরই নিয়ে এলেন নজরুলকে। কোর্ট অভ ওয়ার্ডের ইন্সপেক্টর ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ী এখানেই। তাঁরই ছেলে বীরেন্দ্র কুমার ও আলি আকবর এক-স্কুলেই পড়তেন। সেই সুবাদেই আলির এখানে গতায়াত। বন্ধুত্ব এখন আত্মীয়তার পর্যায়ে। আলি যে বীরেন্দ্রের মাকে মা ডাকেন।

আলিদাকে পেয়ে খুব খুশী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ীর অন্যান্য ছেলে মেয়েরা। খুশীতে হৈ হৈ করে ওঠে দুলি, বাচ্চি, জটু, সন্তোষ।

কিন্তু আর একজন কে? ওই সুন্দর, সুপুরুষ নবীন যুবকটি কে?

আলি আকবর পরিচয় করিয়ে দিলেন, নজরুল ইসলাম।

কিন্তু শুধু কি নামেই পরিচয় স্বার্থক হয়? গুণেরও পরিচয় তো দিতে হবে।

আলি আকবর বললেন, একটা গান শোনাও।

নজরুল গান শোনালেন। একেবারে পরিচয়ের গোড়াপত্তন গানের মাধ্যমেই তা না হলে আর প্রাণের বিস্তৃতি কি করে সম্ভব? কি করে সম্ভব প্রাণের অবধি পাওয়া?

ইন্দ্রকুমারের পরিবার বর্গ সেদিন বুঝলেন অনায়াসেই, নজরুল শুধু সুপুরুষ নন, নন কেবল মাত্র সৌন্দর্যের আধার, আনন্দের চাবিকাঠিও তার কাছেই।

আপন হয়ে উঠলো বেশী সময়ের প্রয়োজন পড়ল না এতে।

ইন্দ্রকুমারের বাড়ীটাই তো আসলে সাহিত্য সঙ্গীতের আবহাওয়ায় ভরপুর। তারপর রয়েছে স্বদেশ প্রেম। জাতীয় অসহযোগ আন্দোলন এ বাড়ীকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে নি। তাই প্রমীলা আর কমলা তুবোনই অনায়াসে একেবারে স্কুল বয়কট করে বসে আছেন। বিদেশী পোশাক পরব না, বিদেশী শিক্ষা নেব না।

প্রমীলাই তুলি বা দোলন, আর কমলাই বাচ্চি। দোলন, বাচ্চি ওদের আটপৌরে নাম। আর দোলনই দোলনচাঁপার চাঁপা।

ফুটবে আবার দোলন চাঁপা
চৈতী রাতের চাঁদনী—
আকাশ ছাওয়া তারায় তারায়
বাজবে আমার কাঁদনী,
চৈতী রাতের চাঁদনী।

প্রমীলা আর কমলা জেঠতুতো খুড়তুতো বোন। তের চৌদ্দ বছরের প্রমীলার চেয়ে হয়তো কমলা বছর খানেকের ছোট। ওদের গর্ভধারিণী গিরিবালা ও বিরজা স্থন্দরী তুজনেই নজরুলকে সন্তান স্নেহে বুকে টেনে নিলেন। নজরুলও অভিভূত। একজন মা আর অন্যজন মাসিমা। মা বিরজা স্থন্দরী আর গিরিবালা মাসিমা।

কুমিল্লার ইন্দ্রকুমারের বাড়ীর চার দেওয়ালের সীমানার মধ্যে বাধা থাকতে পারে না নজরুল-প্রতিভা।

শহরের যুবকেরা ভিড় করে। আমরাও শুনব, শিকল ভাঙার গান।
কিন্তু মানবপ্রেমের গান ছাড়া শিকল ভাঙার গান আসবে কি করে?

জননী আমারি ফিরিয়া চাও
ভাইরা আমার ফিরিয়া চাও।
চাই মানবতা, তাই দ্বারে
কর হানি মাগো বারে বারে—
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।

কুমিল্লায় বেশ উচ্ছ্বাস, আনন্দের মধ্যেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। কিন্তু নজরুল তো কোলকাতা হতে রওনা দিয়েছেন দৌলতপুর যাবেন বলেই। কুমিল্লায় থাকবেন বলে তো আসেন নি তিনি। আলি আকবরের সঙ্গে এসেছেন অতএব তার নির্দেশই সব।

আলি আকবর বললেন, আর নয়, এবার দৌলতপুর।

নজরুল ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, আলি আকবরের অভিসন্ধিটাই বা কি? মাঝে মাঝে জিজ্ঞেসও করেন সে সম্পর্কে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারেন না।

অভিসন্ধি আবার কি? তবে উদ্দেশ্য হয়তো আছে সেটা সাহিত্যিক উদ্দেশ্য। বোঝাবার চেষ্টা করেন আলী আকবর।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

সাহিত্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া আলি আকবরের কি আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না?

ছিল। নিশ্চয়ই ছিল।

আলি আকবর স্বপ্ন দেখতেন:

স্নেহ আদরে গড়া ভাগ্নি নার্গিসের সঙ্গে বিয়ে দেবেন নজরুলের। আর তারপর? তারপর হয় ঢাকায় কিংবা কুমিল্লায় নজরুলকে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া। তাহলেই তার আশা ষোল কলায় পূর্ণ। অন্ততঃ শিশু সাহিত্য প্রচারের যে জীবন-জীবিকা তিনি গ্রহণ করেছেন তার পথে আর কোন অন্তরায় সৃষ্টি হবে না কোনো দিন।

দৌলতপুর যেন নজরুলকে বরাবর হাতছানি দিয়ে ডাকে।

ঠিক হল কুমিল্লা হ'তে দৌলতপুর পায়ে হেঁটেই যাবেন ওরা দুজনে। নজরুল আর আলি আকবর।

ক্লান্তি হয়তো বা আসতে পারে; কিন্তু তারা আমল দেবেন না কোনো মতেই। নজরুলের এক কথা। গাছের তলায় বিশ্রাম করবেন, গান গাইবেন, গান শোনাবেন, সঙ্গে বাঁশি তো আছেই। পথের ব্যবধান আর ব্যবধান বলে মনেই হবে না। তারা ঠিক পৌঁছে যাবেন ঠিক সময়েই।

পৌঁছালেন তারা দৌলতপুরে ঠিক সময়েই।

এ বাড়ি আকবরের নিজের বাড়ি। এখানে নজরুল সম্মুখীন হলেন আর এক নতুন অধ্যায়নের। আলি আকবরের সংসারে কর্ত্রী আলি আকবরের বিধবা বড় দিদি। তার আর এক দিদিও বিধবা হয়েছেন সম্প্রতি। তিনিও এখানে আছেন। তিনিই নার্গিসের মা।

দিদিদের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় করিয়ে দিলেন আলি আকবর।

মস্ত কবি, মস্ত লেখক। নজরুল ইসলাম। আর নজরুলের বাপ কাজী ফকির আহমদ বর্ধমানে চুরুলিয়ার আয়মাদার।

ওরা শোনেন। আলি আকবর বি, এ, পাশ। সুতরাং ভাইয়ের কোন কথাকে ওরা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারে না।

তা ছাড়া গানও গায় খুব ভাল। নুরু একটা গান শোনাও।

বেশী অনুরোধ করার কোন প্রয়োজন নেই নজরুলকে। নজরুল গানও শোনালেন। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েরাও গান শোনে।

কখন যে সকাল গড়িয়ে দুপুরে পৌঁছেছে তার খেয়াল নেই।

নজরুল গান শোনান :

যাস্ কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে ?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ?
দুপুর বেলা পুকুর গিয়ে
একূল ওকূল গেল দুকূল তোর
ওই চেয়ে দ্যাখ পিয়াল-বনের
দিয়াল ভেঙে এলো মুকুল চোর।
বল্ কেমনে দিবি সরম অধর-পরশ সই তাকে ?

চারিদিক হতে শুরু হল নজরুলের আদর-অভ্যর্থনা। সোহাগ-আপ্যায়ন।

আলি আকবর কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন একদিন নজরুলকে।

শুধু কি গানই গাইবে, একদিন তোমার বাঁশি শোনাবে না ?

বাঁশির জন্যে তো নির্জনতা চাই। নির্জনতা আর মেলে কখন ?

কেন, রাত্রে ?

বাঁশি বাজালেন নজরুল।

রাতের নির্জনতা ভরে দিলেন নজরুল বাঁশির সুরে। কিন্তু শ্রোতা ? শুধু কি এই রাতের অন্ধকার, শুধু কি এই নির্জনতা ?

সকাল হতেই ভুল ভাঙল নজরুলের।

তিনি বুঝতে পারলেন আর একজনের হৃদয়-অন্ধকারে তার বাঁশি সুরের একরাশ তারা ফুটিয়ে তুলেছেন।

কাল রাতে আপনরে বাঁশি শুনেছি।

নার্গিস এসে দাঁড়ালেন নজরুলের কাছাকাছি।

শুনেছেন ? কেমন লাগল আপনার ?

খুব সুন্দর।

নজরুল তাকালেন নার্গিসের মুখের দিকে। যে মুখের প্রতিটি রেখায় সৃষ্টির প্রথম রহস্য আলোর ঝলকানি, সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালবাসার সাক্ষী। নজরুল বুঝতে পারলেন নার্গিসের যৌবনের ভাষা যে—ভাষা আত্মসমর্পণের।

নজরুলকে জিজ্ঞেস করলেন আলি আকবর, কেমন লাগল নার্গিসকে?

খুব ভাল।

নজরুলের চোখে মুখে আনন্দের প্রকাশ।

নজরুল কিন্তু জানেন না সমস্ত ঘটনার পশ্চাতে আলি আকবরের হাত রয়েছে। একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনা। বাঁশি বাজানো হ'তে নার্গিসের একাকী নজরুলের সম্মুখে হাজির হয়ে নজরুলের বাঁশির প্রশংসা পর্য্যন্ত।

নজরুল বুঝতে পারেননি কিন্তু খুশী আলি আকবর।

তার প্রয়াস সার্থক হয়েছে!

আলি আকবর নার্গিসের মার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাড়লেন।

ভাইয়ের কথার উপর আর কথা কি?

ভাইয়ের এক কথা, নার্গিসকে নুরুর ভীষণ পছন্দ হয়েছে।

তবু নার্গিসের মার মনে একটা বিরাট সন্দেহ। অতবড় কবি, গায়ক, আয়মাদাদের ছেলে তার কি নার্গিসের মত গ্রাম্য মেয়ে মনে ধরে?

কিন্তু ভালবাসা যে অঘটন ঘটন পটিয়সী।

আলি আকবর বুদ্ধি দিলেন বোনকে। নার্গিসকে আমার হেপাজাতে রাখ কিছুদিন। ওকে ইংরেজী-বাংলা পড়িয়ে কিছুটা উপযুক্ত করে ফেলি।

তাই হল। নার্গিস এখন আলি আকবরের কাছে নিয়মিত পড়াশুনা করেন।

নজরুলের কাছাকাছি নার্গিস এল নাকি? কিন্তু পাশাপাশি হওয়ার জো নেই। আলি আকবরের মাষ্টারী তাদের কাছাকাছি পাশাপাশি হওয়ার বিরাট ব্যবধান। একজন খ্যাতনামা কবির গৃহিনী হিসেবে নার্গিসকে গড়ে পিঠে তৈরী করে নিতেই হবে যে!

কিন্তু নজরুল জানতেন:

কাছে নাই বা এল নার্গিস, না হয় আড়ালেই রইল সে কিন্তু একদিনের গভীর দৃষ্টিতেই তো আমি বুঝেছি সেও আমাকে ভালবাসে।

যে জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে
ভালবাসে আড়াল থেকে
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালবাসায়।

কেটে গেল দেড় মাস।

কলকাতার বন্ধুমহল খবর পেয়েছেন: নজরুল বিয়ে করেছেন। দৌলত-পুরের এক পল্লী কিশোরীকে। আর এই কিশোরীটি আলি আকবরের ভাগ্নি, নার্গিস খানম।

চিঠি লিখলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নজরুলকে:

'যখন আজ তোর চিঠিতে জানলুম যে তুই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তাকে বরণ করে নিয়েছিস তখন অবশ্য আমার কোন দুঃখ নেই। তবে একটা কথা, তোর বয়স আমাদের চাইতে ঢের কম, অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ, ফিলিং-এর দিকটা অসম্ভব বেশি। কাজেই ভয় হয় যে, হয়তো বা দুটো জীবনই ব্যর্থ হয়। যৌবনের চাঞ্চল্য আপাতমধুর মনে হলেও ভবিষ্যতে পস্তাতে হয়। তবে তুই যদি সব দিক ভেবে চিন্তে বরণ করাই ঠিক করে থাকিস, তাহলে আমি সর্বান্তকরণে তোদের মিলন কামনা করছি। বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে? কবে?'

শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিবাহের বাহুবন্ধনে নার্গিসকে নজরুল পেলেন না।

তেরো শ' আটাশ সালের তেসরা আষাঢ়ের কথা।

অতিথি অভ্যাগতদের সামনে মজলিসে বসে বিয়ের চুক্তি হয়ে গেল। কিন্তু তার পরের দিন ভোরেই নজরুল পলালেন।

রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই নজরুল পালালেন কুমিল্লা।

বৃথাই ওগো কেঁদে আমার কাটলো যামিনী
অবেলাতেই পড়ল ঝরে কোমল কামিনী
ওযে শিথিল কামিনী॥
খেলার জীবন কাটিয়ে হেলায়
ভোর না হতে সন্ধ্যে বেলায়
মলিন হেসে চড়লো ভেলায়

মরণ গামিনী
ওরে আমার অনাদৃতা অভিমানিনী।
আহা, একটু আগে তোমার দ্বারে কেন নামিনি ?

কিন্তু কেন পালালো নজরুল ?

আসলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অত্যন্ত অনায়াসেই একটা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে তাকে নিয়ে। কাবিলনামায় শর্ত উঠেছে, নজরুল বিয়ের পর বউকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারবেন না এখানেই ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে।

এ কোন শর্ত ?

কোন প্রেমিক যদি তার বিন্দুমাত্র পৌরুষ থাকে রাজী হতে পারে এমনি শর্তে ?

অতএব পালানো ছাড়া উপায় ?

কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত সপরিবারে নজরুলের বিয়েতে এসেছেন। এসেছেন বিরজা সুন্দরী, গিরিবালা, বীরেন, প্রমীলা, আরো অনেকেই।

নজরুল বিরজা সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করলেন।

মা, আমি চলে যাচ্ছি।

সে কি এই রাত্রে ?

হ্যাঁ মা, এই রাত্রেই। এছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই।

বিরজা সুন্দরী জানেন, লাভ নেই নজরুলকে বাধা দিয়ে। হয়তো বা তিনি নজরুলের চেয়েও বেশী জানতে পেরেছেন।

কিন্তু তুমি যে পথঘাট কিছুই চেননা নজরুল ? একা যাবে কি করে ?

ভয় পাই না মা। একা এসেছি, একাই তো যেতে হবে।

তা কি হয় ? তুমি একা যেতে চাইলেও আমি মা হয়ে কি তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারি নজরুল ? বরং তোমার সঙ্গে বীরেন যাবে। সে পথঘাট চেনে। এদেশের লোকের এ দেশীয় ভাষায় কথা বলার অভ্যাসও তার আছে।

নজরুলের প্রতিবাদ জানানোর আর কিছু নেই।

কিন্তু এতো বিয়ের সভা ছেড়ে বরের পলায়ন। গ্রামবাসী তা ভাল চোখে নেবে কেন ? ষড়যন্ত্র সম্পর্কে খতিয়ে হিসেব করার দায়ই বা তাদের কিসের ? সুতরাং হামলা করার এক্তিয়ার তাদের আছে।

অতএব বীরেন সিদ্ধান্ত নিল নৌকা পথে যাওয়াই ভাল।

সারারাত ওরা নৌকায় বসে কাটালেন।

ভোর হতে না হতেই নৌকা ছেড়ে দিলেন। এবার পদব্রজে যাত্রা হবে শুরু।

রাতের অন্ধকারের দম আটকানো পরিবেশ এখন ভোরের মুক্ত আলোয় আর নেই। মুক্তির উল্লাশে দশ বারো মাইল পথ হেঁটে যাওয়ার আর কোন অসুবিধে নেই ওদের পক্ষে। নজরুলের তো নয়ই।

কুমিল্লা পৌঁছালেন ওরা।

নজরুল চিঠি লিখে জানালেন মুজফ্ফরকে তার বিপদের কথা।

কেন তিনি বিয়ের সভা ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন সেকথাও। এখন তিনি অসুস্থ। অতএব কিছু টাকার বড় প্রয়োজন।

মুজফ্ফর টাকা ধার করলেন। কুড়ি টাকা। তারপর পাঠিয়েও দিলেন নজরুলকে।

কিন্তু মুজফ্ফরের এখন এক চিন্তা—কুমিল্লা যাওয়া প্রয়োজন। নজরুলকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা দরকার।

সমস্যা একটিই, অর্থ।

সংস্কৃত কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে পারলেন নজরুলের বিপদের কথা। প্রসারিত হল তার সাহায্য-হাত। তিনি তিরিশটি টাকা দিলেন।

কিন্তু কে যাবে ?

মুজফ্ফর ছাড়া অগতির গতি আর কে আছে ?

সুতরাং বিনা প্রশ্নে মুজফফ্র আহম্মদ রওনা হলেন কুমিল্লা অভিমুখে।

দৌলতপুর ছেড়েছিলেন নজরুল বিয়ের রাতে।

তারপর কুমিল্লা।

কুমিল্লায় আজ পনেরো দিন কেটে গেল।

আর এই দুই সপ্তাহ প্রমীলা, কমলা, অঞ্জলি সকলের সাথে গানে গানে সমস্ত বাড়ি প্রাণময় হয়ে উঠেছিল। নজরুলের স্নেহকাঙাল মন পেল ওদের

সকলের স্নেহ। 'কচি বাহুর রেশমী ডোরে' নজরুল তাঁর অজান্তেই বাঁধা পড়ে গেছেন।

তোরা কোথা হতে কেমনে এসে
মণি-মালার মত আমার কণ্ঠে জড়ালি ?
আমার পথিক জীবন এমন করে
ঘরের মায়ায় মুগ্ধ করে বাঁধন পরালি…
কেন ঘর ছাড়াকে এমন করে
ঘরের ক্ষুধা স্নেহের সুধা মনে পড়ালি।

বিরজা সুন্দরীর পুত্র স্নেহের কথা নজরুল চিরস্মরণীয় করে রাখতে চাইলেন :

এমন করে অঙ্গনে মোর
ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালী
কেরে তুই কে রে আহা
ব্যথার সুরে রে এমন চেনা স্বরে রে
আমার ভাঙা ঘরে শূন্যতারি বুকের পরে রে
কোন পাগল স্নেহ
সুরধনীর আগল ভাঙালি।

মুজফ্ফর এলেন কুমিল্লায়। ইন্দ্র সেনগুপ্তের বাড়িতেই উঠলেন।

বুঝতে পারলেন মুজফ্ফর পরিবেশ দেখেই, নজরুল এখন আঘাত অনেকটা সামলে উঠেছেন। লাভ হয়েছে বাংলা সাহিত্যের। দুঃখের প্রথম আঘাত সৃষ্টি করেছে অনেক কবিতা, অনেক গান। কিন্তু এখনও নজরুলের জীবনে প্রয়োজন নির্জনতা। নির্জনতা না পেলে সৃষ্টি কর্মে ব্যাঘাত আসবেই। কুমিল্লার গৃহকোনের স্নেহ আর ঘরের বাইরের যুবক সম্প্রদায়ের সবুজ প্রাণ ঘিরে রেখেছে নজরুলকে। এখান থেকে নজরুলকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

দেশ জুড়ে তখন আইন অমান্য আন্দোলনের জোয়ার। আর এই অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের পুরোহিত মহাত্মাগান্ধী। নজরুল লিখলেন :

এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল
বন্দিনী মার আঙিনায়,
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ হরণ

গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।
পণ করেছে এবার সবাই
পরদ্বারে আর যাব না ভাই
মুক্তি যেতো নিজের প্রাণে
নাই ভিখারীর প্রার্থনায়।

নজরুলের ভৈরবীতে ধরা গানই শেষ পর্য্যন্ত পরিণতি পাবে শিকল ভাঙার গানে।

দুটো দিন কেটে গেল দেখতে দেখতে।

এবার মুজফ্‌ফর সিদ্ধান্ত নিলেন কোলকাতায় ফিরতে হবে।

নজরুলকে বললেনও সে কথা

ওরা রওনা হলেন কোলকাতা অভিমুখে।

কিন্তু বিধি বাম।

তাই কুমিল্লা হ'তে চাঁদপুরে এসে তারা ষ্টিমার ধরতে পারলেন না। গাড়ীটা লট ছিল। ষ্টিমার আগেই চলে গেছে।

কিন্তু উপায়?

চাঁদপুরে থাকা চলে কিন্তু চাঁদপুরে শুধু থাকলেই তো নয় এর জন্য যথেষ্ট টাকারও প্রয়োজন সে টাকা তো তাদের নেই।

শেশ পর্য্যন্ত নানা রকম চিন্তা পরিকল্পনার শেষে ডাক বাংলোতে ওঠারই সিদ্ধান্ত নিলেন। এলেন দুজনেই ডাক বাংলোয়।

মুজফ্‌ফর অনেক ভাবনা চিন্তা শেষে শেষ পর্য্যন্ত কোলকাতায় টেলিগ্রাম করলেন। টাকা পাঠাও।

কিন্তু কোথায় টাকা?

অবশ্য ওদের এই-অসুবিধার কথা তখন হরদয়াল নাগের কাছে পৌছেছে। তিনি জানতে পেরেছেন মাত্র বারোটি টাকার জন্য চাঁদপুরের ডাকবাংলোয় আটকা পড়েছেন মুজফ্‌ফর ও নজরুল ইসলাম। কোলকাতা যাওয়ার মত টাকা তাদের হাতে নেই।

হরদয়াল নাগ চুপ করে থাকতে পারলেন না এ সংবাদ পেয়ে।

তিনি খবর পেয়েই সেই বারোটি টাকা মুজফ্‌ফরের হাতে পৌছে দিলেন।

মুজফ্‌ফর এখন নিশ্চিন্ত।

অন্ততঃ রেস্ত-এর অভাবে কোলকাতা যাওয়া স্থগিত রাখতে হবে না।

ওরা শেষ পর্য্যন্ত কোলকাতা পৌছালেন।

উঠলেন তালতলা লেনের চৌত্রিশের সি নম্বর বাড়ীতে।

উনিশ শ' একুশের ডিসেম্বর।

বাংলাকাব্যের পালা বদলের অধ্যায়।

আর এ অধ্যায়ে যিনি বলিষ্ট ভূমিকা নিলেন তিনি নজরুল।

নজরুল এখন বিদ্রোহী।

বল বীর
বল উন্নত মম শির
শির নোহারি আমারি, নতশির ওই
শিখর হিমাদ্রির।

কবিতা এখন স্পষ্ট ঋজু। ভাগ্যের পরিহাসের বিরুদ্ধে তীব্র অট্টহাস।

নজরুল একেবারে সংহার মুর্তিতে রুদ্ররূপ নিলেন—

আমি যুগে যুগে আসি—
আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধুমকেতু!

কিন্তু কেন?

কেন এই সংহার মূর্তি?

কেনই বা তার বৈশ্বানর হয়ে ওঠা?

নজরুল কি বলেন? তাঁর অভিমতই বা কি?

"তুমি এই আগুনের পরশমাণিক না দিলে আমি অগ্নিবীনা বাজাতে পারতাম না—আমি ধুমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হ'তে পারতাম না।"

তাহলে কি নার্গিসের কাছ থেকেই এমন বৈশ্বানর হয়ে উঠার মন্ত্র পেলেন নজরুল। হয়তো বা তাই হবে। তা না হলে এমন কথা নার্গিসকে চিঠি লিখে নজরুল জানাতে যাবেনই বা কেন?

নজরুল তো সত্যই নার্গিসকে ভাল বেসেছিলেন, একদিন তাকে দেবী মূর্তিতে বসিয়েছিলেন তাঁর হৃদয় বেদীতে। কিন্তু এক যুগ পরে যখন নার্গিস নজরুলকে নতুন করে পেতে চাইলেন তখন কিন্তু নজরুল সাড়া দিতে পারলেন না।

নজরুল তাই ত্রিশবছর বয়সে লেখা নার্গিসের চিঠির উত্তরে লিখলেন :

"তুমি রূপবতী, গুণবতী, বিত্তশালিনী, কাজেই তোমার উমেদার অনেক জুটবে—তুমি যদি স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হও, আমার তাকে কোনো আপত্তি নেই। আমি কোন অধিকারে তোমায় বারণ করব বা আদেশ দেব? নিষ্ঠুর নিয়তি সমস্ত অধিকার থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

তোমার আজিকার রূপ কি জানিনা। আমি জানি সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবীমূর্তির মত আমার হৃদয় বেদীতে অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ দেবীর মতই বেছে নিলে বেদনার বেদী পীঠ। জীবন ভরে সেইখানেই চলেছে আমার পূজা আরতি। আজিকার তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ তাই তাকে পেতে চাইনে।"

নার্গিস ভুল বুঝেছিলেন নজরুলকে। ভেবেছিলেন নজরুল হয়তো বা কোন হীন প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করবেন। তেমন ইঙ্গিত নার্গিস তার লেখায়, তার চিঠিতে করেছিলেন। নজরুল সেই সম্পর্কে তাকে লিখলেন :

"তোমার উপরে আমি কোন জিংঘাসা পোষণ করি না—এ আমি সকল অন্তর দিয়ে বলছি। আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কী গভীর ক্ষত, কী অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি—তা দিয়ে তোমায় কোনোদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তোমার যে কল্যাণ রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে দেখেছিলাম, যে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম, সে রূপ আজও স্বর্গের পারিজাত—মন্দারের মত চির-অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে! অন্তরের আগুন বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারি নি।"

নার্গিস হয়তো ভেবেছিলেন নজরুল এখনো তার সঙ্গে মিলনেচ্ছুক। তাই হয়তো নজরুল দূত পাঠিয়েছেন নার্গিসের কাছে। কিন্তু একথা তো সত্য নয়। নজরুল তো নিজেই লিখেছে সেকথা :

"আমি কখনো কোনো 'দূত' প্রেরণ করিনি তোমার কাছে।

আমাদের মাঝে যে অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে তার সেতু, কোন লোক তো নয়ই স্বয়ং বিধাতাও হতে পারেন কিনা সন্দেহ।"

কিন্তু নজরুল নার্গিসকে যেমন আঘাত করেছেন তেমনি স্বীকারও করেছেন অন্তরঙ্গ করে ভালবাসার কথা ঃ

"আমার অন্তর্যামী জানেন—তুমি কি জান বা শুনেছ জানিনা—তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অনুযোগ নেই অভিযোগ নেই দাবীও নেই। আমায় বিশ্বাস করো, আমি সেই 'ক্ষুদ্র'দের কথা বিশ্বাস করিনি। করলে পত্রোত্তর দিতাম না। আবার বলছি, তোমার উপর আমার কোন অশ্রদ্ধাও নেই, অধিকারও নেই। আর আঘাত? তুমি ভুলে যেওনা আমি কবি, আঘাত করলেও ফুল দিয়ে আঘাত করি। অসুন্দর, কুৎসিতের সাধনা আমার নয়।

মনে পড়ে গেলে পনেরো বছর আগেকার কথা তোমার জ্বর হয়েছিল, বহু সাধনার পর আমার তৃষিত দুটি কর তোমার শুভ্র সুন্দর ললাট স্পর্শ করতে পেরেছিল; তোমার সেই তপ্ত ললাটের স্পর্শ যেন আজও অনুভব করতে পারি। তুমি কি চেয়ে দেখেছিলে? আমার চোখে ছিল জল, হাতে সেবা করার আকুল স্পৃহা, অন্তরে শ্রী বিধাতার চরণে তোমার আরোগ্য লাভের জন্য করুণ মিনতি। মনে হয় যেন কালকার কথা। মহাকাল সে স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলেন না! কী উদগ্র অতৃপ্তি, কী দুর্দমনীয় প্রেমের জোয়ারই সেদিন এসেছিল! সারা দিনরাত আমার চোখে ঘুম ছিল না।"

নার্গিস ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলেন। ভালবাসা তো চিরকাল ক্ষমাই করে।

কিন্তু নজরুলের এক কথা ঃ

"প্রেমের সোনার কাঠি স্পর্শ পেয়ে যদি থাক, তাহলে তোমার মত ভাগ্যবতী কে আছে? তারই মায়াস্পর্শে তোমার সকল কিছু আলোময় হয়ে উঠবে। দুঃখ নিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে গেলেই সেই দুঃখের অবসান হয় না।

মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনা দিয়ে তপস্যা দিয়ে ভুলকে ফুলরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যদি কোন ভুল করে থাক জীবনে, এই জীবনেই তার সংশোধন করে যেতে হবে, তবেই পাবে আনন্দ, মুক্তি, তবেই হবে সর্বদুঃখের অবসান। নিজেকে উন্নত করতে চেষ্টা কর, বিধাতা তোমার সহায় হবেন।"

নার্গিস দেখা করার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন। একবার চোখের দেখাও কি তিনি পাবেন না?

নজরুল লিখলেন ঃ

"দেখা নাইবা হল এ ধূলির ধরণীতে। প্রেমের ফুল ধূলিতলে হয়ে যায়

ম্লান, দগ্ধ হতশ্রী। তুমি যদি সত্যই আমার ভালবাস, আমাকে চাও, ওখান থেকেই আমাকে পাবে। লায়না মজনুঁকে পায়নি, শিরিঁ ফরহাদকে পায়নি, তবু তাদের মত করে কেউ কারো প্রিয়তমকে পায়নি।"

প্রেমের চেয়ে প্রেমের বেদনার মূল্য যে অনেক গুণ বেশী।

তাইতো নজরুল নার্গিসকে লিখলেন:

"তোমার পত্র পেয়েছি—সেদিন নববর্ষার নবঘন সিক্ত প্রভাতে। মেঘমেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরঝিল। পনেরো বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারি ধারার প্লাবন নেমেছিল—তা তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পারো! আষাঢ়ের নবমেঘ পুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূত বিহারী যক্ষের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে, রেবা নদীর তীরে মালবিকার দেশে, তার প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চয়। এই আষাঢ় আমার কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে।

হারানো অতীত। কিন্তু এই হারানো অতীতের কান্না নজরুলের অন্তরের বার বার গুমরে উঠেছে।

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল।
কেন তুমি ফুটলে সে ব্যথার নীলোৎপল।

সাধকের পক্ষে দুঃখ ভোলা যত সহজ কবির পক্ষে দুঃখ বিসর্জন দেওয়া যে তত দুরূহ। তাই—

পারাবারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না"
এই তরীতে হয়তো তোমার পড়বে রাঙা পা।
আবার তোমার সুখ-ছোঁয়ায়
আকুল দোলা লাগবে এ নায়
এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ,
পারাবারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না॥

জন্ম নিলেন নতুন কবি।

নির্জীব ভারতে ছড়িয়ে পড়ল এই নতুন কবির বীর্যবাণী।

সুপ্তি হ'তে জাগরণ ঘটল শুধু বাংলা দেশের নয় সমগ্র দেশের।

কেউ কি ভাবতে পেরেছিলেন এমন কথা : ভাবে গদগদ বিহ্বল দেশ এমন ভাবে আলস্য ছেড়ে উন্নত মেরুদণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে ?

আমি ধূর্জটি, আমি এলো কেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী- সুত বিশ্ব বিধাত্রীর।
বল বীর
চির উন্নতি মম শিশ

মোহাচ্ছন্ন জাতি মোহমুক্তি শেষে, সুপ্তিতে আচ্ছন্ন জাতি সুপ্তি ভঙ্গে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন নতুন কবির এই বিদ্রোহ ঘোষণার দিকে।

উনিশ শ' একুশ সালের ডিসেম্বরে 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় এ কবিতা প্রকাশিত হল। ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে একটি নাম, নজরুল ইসলাম। বাইশ বছর সাতমাসের নজরুল ঘোষণা করলেন এই বিদ্রোহ।

কিন্তু কার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ?

সমস্ত রকম অত্যাচারের প্রতিবাদ যেন জানালেন তিনি। অধীনতার বিরুদ্ধে কণ্ঠ তাঁর সোচ্চার হয়ে উঠল। অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতাই যেন বিদ্রোহের মূল সুর। আর কি তার দুর্বার বেগ।

আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন,
যত নিয়ম-কানুন শৃঙ্খল।

ব্রিটিশ-ভারতে তখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চলছে।

এই তো সেদিন গত নভেম্বরে ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত আগমনের প্রতিবাদে সারা মুখর হয়ে উঠল। সারা ভারত জুড়ে হরতাল আর হরতাল। কোলকাতাতেই অবশ্য হরতাল সফল হল সবচেয়ে বেশী। কবিতার মূল প্রেরণা নিঃসন্দেহে সেই রাজনৈতিক যুগ প্রয়োজনেই :

আমি চির দুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস
মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ,
আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,

আমি শাসন-ত্রাসন সংহার
আমি উষ্ণ চির-অধীর।

ক্ষমতা-মদমত্ত ব্রিটিশ শাসক সেদিন এ কবিতার উপর রাজদ্রোহের লেবেল এটে দিতে পারল না। হিন্দু মুসলমান দুই জাতিরই পুরাণ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এ কবিতার অনেক স্থানেই সুতরাং সাধ্য হয়নি ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর সরাসরি এ কবিতাকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে দণ্ডনীয় করা।

এ কবিতাকে রাজদ্রোহিতার লেবেল পরালে যে ধর্মের উপরেও হস্তক্ষেপ করতে হয়। যখন এ বিদ্রোহ ভগবানের বিরুদ্ধেও—

আমি বিদ্রোহী ভৃগু,
ভগবান বুকে এঁকে দেব পদচিহ্ন,
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।

কিন্তু শুধু কি তাই? প্রথম প্রেয়সীকে না পাওয়ার বেদনাও এ কবিতায় মূর্ত—অপমানিত হয়ে ফিরে যাওয়ার যন্ত্রণার প্রকাশও যে সুস্পষ্ট।

আমি বঞ্চিত ব্যথা পরবাসী
চির গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম বেদনা
বিষ জ্বালা প্রিয়লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের।
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার
কাতরতা ব্যথা সুনিবিড়
চিত-চুম্বর-চোর-কম্পন আমি
থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর

কিন্তু শুধু তো ধ্বংসই নয় এ বিদ্রোহ যে আবার নতুন সৃষ্টির জন্যও। অন্ধকার নিয়ে এসে আবার সেই অন্ধকার দূর করে আলোর বন্যা বইয়ে দেওয়া বিদ্রোহ।

আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস
আমি লোকালয়, আমি শ্মশান
আমি অবসান, নিশাবশান।
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী
আমি রণদা সর্বনাশী

আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া
হাসি পুষ্পের হাসি

*　　　　*

আমি হল বলরামের স্কন্ধে
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব
অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে

নতুনতর মানবতার উদ্বোধন ঘটেছে এ কবিতায়—

আমি বিশ্ব তোরণে বৈজয়ন্তী
মানব-বিজয় কেতন।

পরাধীনতার সমুচ্ছেদে মানবতার জয়গানে মুখর এ কবিতা—

আমি আপনাদের ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ।

হয়তো বা এ কবিতায় ভাব এলোমেলো কিন্তু বন্ধনমুক্তির বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের প্লাবন যে সাধারণ মানুষের হৃদয় বেলাভূমিতে পৌছে তরঙ্গাভিঘাত তোলে। আমাদের প্রাণের অব্যক্ত ভাষা যে অর্গল মুক্তিতে এ কবিতায় রূপ পেয়েছে। তাই এ কবিতাই নজরুলকে পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছে জনমানসের সঙ্গে— নজরুল বাঁধা পড়েছেন অন্তরঙ্গতার নিবিড় বন্ধনে।

বিদ্রোহী কবিতা লেখা হল।

এ কবিতার প্রথম শ্রোতা মুজফ্ফর আহমদ।

তিনি শুনলেন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে কিন্তু কোন উচ্ছ্বাস নয়, নয় কোন বাগাড়ম্বর। শুধু জানতে ছাইলেন কোথায় এ কবিতাটা ছাপতে দেবে ?

দেখি। নজরুলও আর কোন কথা না বাড়িয়ে পাণ্ডুলিপিটা ভাঁজ করে জামার পকেটে রেখে দিলেন।

বিদ্রোহীর দ্বিতীয় শ্রোতা নলিনীকান্ত সরকার।

নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে নজরুলের প্রথম পরিচয় বিজলী-অফিসেই।

বিজলী পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর একজন তিনি।

নলিনীকান্ত বিজলী-অফিসে পৌছেছেন। দেখলেন বারীন ঘোষ কয়েকজন তরুণকে নিয়ে বসে আছেন।

বারীন ঘোষ জানতে চাইলেন নলিনীকান্তের কাছ হতে, নজরুল ইসলামের কবিতা পড়েছ ?

পড়েছি। হাবিলদারের মতই কবিতা।

আসলে সেকালে নজরুল ইসলাম কবিতা ছাপতে দিলে নিজের নামের সঙ্গে হাবিলদার পদবীটা জুড়ে দিতে চাইতেন।

বারীন ঘোষ উপস্থিত তরুণদের মধ্য হতে একজনকে চিহ্নিত করে বলে উঠলেন, ইনিই সেই হাবিলদার নজরুল ইসলাম।

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন নলিনীকান্ত।

কিন্তু নজরুলের সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

তিনি হেসে উঠলেন।

বন্ধুর আমন্ত্রণ জানানো সে হাসি।

সেদিন থেকেই কিন্তু নজরুলের কাছে নলিনীকান্ত সরকার হয়ে উঠলেন নলিনীদা।

আর নলীনিকান্ত সরকারের কাছে নজরুল ইসলাম, স্নেহভাজন নজরুল।

নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নজরুলের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। তিনি পড়েছেন তার কবিতা। বয়স অনুপাতে তার কবিতা নতুন বক্তব্য আর নতুন ভঙ্গিতে অত্যন্ত বেশী প্রাণোচ্ছল! ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের সঙ্গে নলিনীকান্তের দেখা হতেই তাকে তার মনের কথা তিনি জানালেন।

নজরুলকে একবার নিয়ে আসতে পার।

নলিনীকান্ত কথা দিলেন।

তাই সেদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই নজরুলের তালতলা লেনের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। শুধু মাত্র তার একটাই ভাবনা নজরুলের সঙ্গে দেখা হবে ত?

দেখা হয়েছিল সেদিন।

নলিনীদা প্রস্তাব দিলেন। ক্ষীরোদ প্রসাদের কথা তিনি জানালেন নজরুলকে।

তিনি রাজী।

বললেন, এক্ষুনি যাবো। কিন্তু আমার একটা কবিতা শোনাব।

বেশ তো শোনাও না।

নজরুল শোনালেন তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা তাঁর দ্বিতীয় শ্রোতাকে।

নলিনীকান্ত শুনলেন সে কবিতা। প্রশ্ন করলেন, কবে লিখলে ?

কাল রাত্রে শুরু করেছিলাম, আর আজই ভোরে শেষ হয়েছে।

এ কবিতাটা কিন্তু বিজলীতে প্রকাশের জন্য আমার চাই।

নজরুল রাজী হয়ে গেলেন।

বিমুখ তিনি কাউকে কোন কারণেই করেন না। করতে পারেন না।

রওনা হলেন নজরুল নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা-বিনোদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে।

দেখা হল ক্ষীরোদ প্রসাদের সঙ্গে। তিনি নজরুলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন,

বাস্তবিক কী সুন্দর তোমার লেখা, 'হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন—'

সময় কাটল খানিকটা।

চা খাওয়ার পালাও চুকল।

নলিনীকান্ত বললেন, নজরুলের একটা নতুন কবিতা শুনুন।

নজরুলকে দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন নেই।

পকেট হতে বিদ্রোহী কবিতার পাণ্ডুলিপি বের করে তিনি আবৃত্তি করে শোনালেন ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে।

পড়া শেষ হল অবশেষে।

খুশীতে ঝলমল করে উঠলেন ক্ষীরোদ প্রসাদ।

আশীর্বাদ করলেন নজরুলকে,

"তুমিই হিন্দু মুসলমানকে মেলাতে পারবে। তুমি এই অসাধ্য সাধন করবার জন্যেই জন্মেছ বাংলাদেশে।

বিদ্রোহী কবিতার কপি নেওয়ার জন্য এর পর একদিন যথা সময়ে নলিনীকান্ত দেখা করলেন নজরুলের সঙ্গে। বললেন, দাও লেখাটা।

কিন্তু নজরুলের তখন দেওয়ার আর উপায় নেই।

কারণ মোসলেম ভারতে প্রকাশের জন্যে বিদ্রোহী কবিতা আফজল নিয়ে গেছেন এরই মধ্যে।

কিন্তু তুমি যে আমাকে কথা দিয়েছিলে, ওই কবিতাটা আমাকে দেবে। অভিমানাহত ক্ষোভ নলিনীকান্তের কণ্ঠে।

নজরুল নিজেকে বড় অসহায় অপরাধী ভাবতে লাগলেন। তারপর পাণ্ডুলিপির যে লেখাটা তার কাছে ছিল সেটাই তাকে দিয়ে দিলেন, বললেন, তুমিও নাও এটা।

কাউকে ফেরানো বুঝি নজরুলের স্বভাব বিরুদ্ধ।

নলিনীকান্ত ঠিক করে নিলেন আশু কর্তব্য।

মোসলেম ভারতের উপর তাকে টেক্কা মারতেই হবে। কিন্তু কাজ হাঁসিল করতে হবে সব দিক বাঁচিয়ে কাউকে ক্ষুন্ন করে নয়।

হাজির হলেন মোসলেম ভারত অফিসে।

দেখলেন পত্রিকার ছাপানো ফর্মা। কিন্তু বই আকারে মোসলেম ভারত প্রকাশিত হতে তখনও অনেক দেরী! সকলের অজ্ঞান্তে তিনি রচনা ও লেখকের নামগুলো সেই ছাপানো ফর্মা হতে টুকে নিলেন।

ব্যস্, আর কে পায় তাকে?

আফজলের গর্বভরে উচ্ছ্বাসের উত্তর নলিনীকান্ত দেবেনই। আফজল যে কিছুক্ষণ আগেই তাকে ছাপানো ফর্মাগুলো দেখিয়ে বলেছেন, কই পারলে নাতো বিদ্রোহী বিজলীতে প্রকাশ করতে। এই দেখ মোসলেম ভারতেই কবিতাটা বেরোচ্ছে।

নীরবে সে কথাগুলো হজম করে নিয়ে ফিরে এলেন নলিনীকান্ত।

লিখে ফেললেন, মোসলেম ভারতের সেই সংস্করণের সমালোচনা। তারপর জুড়ে দিলেন, আমাদের স্থান সঙ্কুলান না হলেও বিদ্রোহী কবিতাটা বিজলীর পাঠক-পাঠিকাকে উপহার না দিয়ে পারলাম না।

ছাপা হল বিদ্রোহী কবিতা বিজলী পত্রিকায় মোসলেম ভারত প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই।

অথচ করার কিছু নেই, কারণ মোসলেম ভারতের কবিতা বিজলী সঙ্কলন করেছে মাত্র।

বিজলীতে প্রকাশিত হল নজরুলের বিদ্রোহী।

আর এই বিদ্রোহী কবিতাই নজরুলের পরিচিত করিয়ে দিল বাংলাদেশে। তখন এ কবিতা যে তুলেছে দিকে দিকে আনন্দের তরঙ্গ।

এ আনন্দ সুপ্তি থেকে জাগরণের, এ আনন্দ উন্নতমম শির ঘোষণার।

আসলে এ কবিতার মাধ্যমেই যে সম্ভবপর হল বাঙালির আত্মআবিষ্কার।

ঠিক করলেন নজরুল নিজেই, তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। সঙ্গে নিয়ে যাবেন বিজলীতে ছাপা বিদ্রোহী কবিতা।

ঠিক যখন একবার করেছেন তখন তিনি যাবেনই।

কেউ কেউ নিষেধ করলেন। বললেন আগে হ'তে যোগাযোগ না করে, সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারণ না করে যাওয়াটা সমীচীন হবে না।

কিন্তু নজরুল ওসব কথা মানতে চান না।

একজন কবি আর একজন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন তার জন্য এত পাঁজিপুথির হিসাব আসে কেন তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

হাজির হলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে।

দরজায় কারুর জন্য অপেক্ষা করতে তার মন চাইল না। গুরুদেব গুরুদেব বলে ডাকতে ডাকতে তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ সে ডাক শুনতে পেয়েছেন। উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার সামনে।

নজরুল এলেন। দাঁড়ালেন তাঁর সামনাসামনি।

বললেন, আমি কাজী নজরুল ইসলাম।

আরে তুমি এসো এসো। তা হঠাৎ একেবার ঝড়ের বেগে চলে এলে যে?

আমি আপনাকে হত্যা করব?

তাই না কি? তোমার হাতে ওটা কি? অস্ত্র নাকি?

হ্যাঁ এটাই আমার অস্ত্র। আমার কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, বেস বসো। বসে শোনাও আমাকে কবিতাটা।

নজরুল বসলেন না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিতাটা পড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথকে।

বল বীর
চির উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি, নত শির ওই
শিখর হিমাদ্রির

রবীন্দ্রনাথ নজরুলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিস্ময়ভরা দুটি চোখ মেলে। নজরুলের উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি ঘুরে ঘুরে ফিরতে লাগল সারা ঘরময়।

মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতে ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপান
ভীম রণ ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

পড়া শেষ হল অবশেষে।

মুহূর্ত কয়েকের নিস্তব্ধতা।

তারপর রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে একেবারে বুকে টেনে নিলেন। বললেন, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অতিক্রম করে যাবে। তোমায় আশীর্বাদ করি, তুমি বিশ্বজয়ী কবি হও।

নজরুল প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথকে।

যেন প্রণামেই বিদ্রোহের শুরু এবং শেষ।

বিদ্রোহী কবিতা হতেই কিন্তু ভাঙার গান শুরু হয়নি।

শুরু হয়েছে আরও আগে।

নজরুল তখন কলেজ ষ্ট্রিটের বাসায়।

সুকুমার রঞ্জনদাস এলেন।

নজরুলের সঙ্গে দেখা করলেন।

কী ব্যাপার ?

বাসন্তীদেবী আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

কেন ? বলুন আমাকে কি করতে হবে ? নজরুলের চোখ মুখে কর্মযোগীর ঔজ্জ্বল্য।

বাঙলার কথায় আপনার একটা কবিতা ছাপবে তিনি। সেই জন্যই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন জেলে, জেলে মহান বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রও। সুতরাং বাসন্তীদেবী ছাড়া এ পত্রিকা দেখাশুনা করবে কে? তিনিই দেখা শুনা করছেন। পত্রিকা দেখা শুনার দায়িত্বও তিনি নিজেই নিয়েছেন।

বসুন। দিচ্ছি।

লেখা তৈরী আছে।

না। তবে এখনই লিখেই আপনাকে দিয়ে দেব।

সুকুমার রঞ্জন দাসের বলার নেই কোন কিছু। তিনি অবাক।

মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে ফিস ফিস করে আলাপ শুরু করলেন।

আর নজরুল ?

তিনি লিখছেন ভাঙ্গার গান।

এই যে। নিন লেখাটা।

সেকি ? এরই মধ্যে হয়ে গেল ? সুখরঞ্জন দাসের বিস্ময়ের সীমারেখার তখন আর অবধি নেই।

হ্যাঁ ভাই হয়ে গেছে। না, না সব ঠিক। দেখাশুনা করার আর কিছু নেই। বরং কবিতাটা একবার শুনুন। আমি পড়ছি। আসলে অবশ্য এটা একটা গান। যদি চান গানটা গেয়েও শোনাতে পারি।

নজরুল আবৃত্তি করলে।

তারপর সুরারোপ করে গেয়ে উঠলেন :

কারার ওই লৌহকপাট
রক্ত জমাট
শিকল-পুজোর পাষাণ বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি!

ভীম কারাগারের ভিত্তি নড়ে উঠল যেন এ গানে! পদাঘাতে অর্গ মুক্ত হল কারাগারের বন্ধ দ্বার।

এই ভাঙার গানইতো সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান মন্ত্র। এ গান বাংলার মর্ম কথা হয়ে প্রকাশিত হল বাঙ্গলার কথায়।

আবার কুমিল্লা। এবার নজরুলের কাছে এসেছে নতুন ডাক।

ঘর বাঁধার ডাক।

একদিকে বিপ্লব আর অন্যদিকে প্রেমের আহ্বান।

আসলে নজরুলের প্রেমও যে বিপ্লব।

উনিশ শ' বাইশের ফেব্রুয়ারী। নজরুল কুমিল্লায় এলেন।

সেই ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায়।

জননী বিরজা সুন্দরীর স্নেহের আকর্ষণকে, প্রমীলার সরল আয়ত চোখের আহ্বানকে উপেক্ষা করবেন নজরুল সে সাধ্য তার কোথায়?

অতএব এবারে থেকে যেতে হল কুমিল্লায় একটানা বেশ কয়েক মাস।

প্রমীলাকে ভালবাসলেন নজরুল। প্রমীলাও।

হেমোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি
আজ শেষে।
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার
চরণতলে এসে।
আমার সমর জয়ী অমর তরবারী
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে হয়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার-মানা হার পরাই তোমার কেশে।

প্রমীলা তপস্বিনী নজরুলকে তো শুধু কবি করবেন না করবেন ভক্ত সাধক!
তুমি আমায় ভালবাসো তাইতো আমি কবি।

আমার এরূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।
আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ বাতাশ প্রভাত আলো
বিদায় বেলায় সন্ধ্যাতারা
পূবের অরুণ রবি—
তুমি ভালোবাসো বলে ভালোবাসে সবি ॥

গিরিবালা স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন ঃ মেয়ে প্রমীলা যখন নজরুল ইসলামকে ভালবেসে বরণ করে নিয়েছে তখন তিনি কোন কারণেই ওদের বিমুখ করবেন না। প্রমীলাকে তিনি নজরুলের হাতেই সমর্পন করবেন। কতইবা আর বয়স হয়েছে প্রমীলার? সবে মাত্র কৈশোরের সীমারেখা পার হয়ে যৌবনের দ্বারে উপনীত। তবু একবার বরণ করে নিয়ে আর ফেরা চলে না, ফেরা চলবে না। প্রমীলার বৈধী অভিভাবিকা মা গিরিবালা যখন তার পক্ষে তখন ভয় কি প্রমীলার?

কিন্তু সমাজ?

সমাজ মেনে নেবে কেন?

তাই বইতে শুরু হল প্রতিকূলতার ঝোড়ো হাওয়া। মেনে নিলেন না ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, মানতে পারলেন না তারই পুত্র বীরেন সেনগুপ্তও। আর আত্মীয় মহল? ওরা যে মেনে নেবেন না সে কথা কোন প্রশ্নেরই অপেক্ষা রাখেনা।

কিন্তু গিরিবালা?

স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মেয়ের ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি সচেতন। তিনি নজরুলকে কথা দিলেন।

মে মাস নাগাদ ফিরে এলেন নজরুল কোলকাতায়।

কুমিল্লা নয়—এবার কোলকাতা।

কিন্তু কুমিল্লায় থাকা কালীন মে মাসেই নজরুল প্রলয়োল্লাস কবিতা লিখলেন:

তোরা সব জয় ধ্বনি কর
তোরা সব জয় ধ্বনি কর!
ওই নূতনের কেতন ওড়ে
কাল বোশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর

জড়ায় যারা মুমূর্ষু, যারা আধ, পতিত পীড়ি প্রবঞ্চিত তাদেরই সৌভাগ্যের সূচনা কোরল রাশিয়ার বিপ্লব বাদে। তাদের মধ্যে জাগানো হল মানবতা বোধ, সমত্ব বোধ, জ্বালানো হল আশার আলো।

মাভৈ: মাভৈ: জগৎজুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে
জড়ায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ওই বিনাশে।

এবার মহা নিশার শেষে
আসবে উষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে,
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর !

তোরা সব জয় ধ্বনি কর !
তোরা সব জয় ধ্বনি কর !!

বাঙলা দৈনিক সেবকে নজরুল কাজ নিলেন। মাস মাহিনা একশো টাকা।

কিন্তু মনে প্রাণে নজরুল সুখী ছিলেন না।

স্বাধীনতা হারিয়ে কাগজ বের করার জন্য তার মনে যে তীব্র দহনের সৃষ্টি তার প্রশমন কৈ ?

নজরুল সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। স্বাধীনভাবে পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ।

অবশেষে সে সুযোগ তিনি পেলেন।

হাফিজ মসুদ আহমদ দেখা করলেন নজরুলের সঙ্গে।

একটা বাংলা সাপ্তাহিক বের করব। সম্পাদক হবেন ?

নিশ্চয়ই।

নজরুলের এখন আর অন্য কিছু ভাববার অবসর নেই। এমন সুযোগ হিসেব—নিকেশ করে নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।

মামুদ আহমদের মুখের দিকে তাকালেন নজরুল, বললেন, সম্পাদক না হয় হলাম। কিন্তু টাকা ? টাকা ছাড়া তো আর পত্রিকা বেরোবে না।

আড়াইশো টাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

বেশ। ওতেই হবে।

কিন্তু ইংরেজ বিরোধী গরম লেখা চাই।

লেখা নয় আহ্বান। জাতিকে আহ্বান জানাতে হবে। নজরুলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাতিকে সুপ্তি হতে জাগরণে পৌছে দেওয়ার দায়িত্বই নেবে তাঁর এ নতুন পত্রিকা।

কাগজের নাম কী হবে? প্রশ্ন করলেন নজরুল।

হাফিজ মসুদ আহমদ আর কি বলবেন। নামকরণের দায়িত্বও দেওয়া হল নজরুলের উপরেই।

ঠিক হল ওই নতুন বাংলা সাপ্তাহিকের নাম হবে ধূ-মকেতু।

ব্যস।

কারও সঙ্গে শলাপরামর্শ নেই, নেই কোন চিন্তা ভাবনা—মহাশূন্যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গহ্বরে ঝাপিয়ে পড়লেন নজরুল।

নজরুল তখন কলেজষ্ট্রিটে।

বত্রিশ নম্বর কলেজ ষ্ট্রিটই হল ধূমকেতুর অফিস।

আফজল এই পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর।

অর্ধসাপ্তাহিক ধূমকেতুর জন্য নজরুল আশীর্বাদ চেয়ে পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাছে। বারীন ঘোষ উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ধূমকেতুকে উপলক্ষ করে একটি কবিতা, শরৎচন্দ্র পাঠালেন আশীর্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোকনা লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন॥

আর শরৎচন্দ্র? তিনি লিখলেন:

"তোমাদের কাগজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটিমাত্র আশীর্বাদ করি যে

শত্রুমিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তারপর ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।"

বারীন ঘোষও বিমুখ করলেন না নজরুলকে।

"আশীর্বাদ করি তোমার ধূমকেতু দেশের যারা মেকি, তাদের গোঁফ ও দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিক। আশীর্বাদ করি তোমার ধূমকেতু জতুগৃহ জ্বালিয়ে দিক।"...

লিখলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও :

"রুদ্র রূপ ধরে ধুমকেতুকে চড়ে তুমি দেখা দিয়েছ—আমি প্রাণ ভরে বলছি, স্বাগত। সৃষ্টি যারা করবার তারা করবে, তুমি মহাকালের প্রলয় নিশাণ এবার বাজাও। অতীতকে আজ ডোবাও, ভয়কে আজ ভাঙো, মৃত্যু আজ মরণের ভয়ে কেঁপে উঠুক।"

এল উনিশ'শ বাইশের বারোই আগষ্ট।

প্রকাশিত হল ধুমকেতু।

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টা রশনি মহাকাল ঘুমকেতু।

মহাবিপ্লবই বটে। একে সন্ত্রাসবাদের সীমারেখায় আবদ্ধ করা চলে না। এ আন্দোলন মহাবিপ্লব বৈ কি! এ আন্দোলন তো সমগ্র জাতিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান।

নজরুল লিখলেন

"এস ভাই পথের সাথী বন্ধুরা, এস আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দল! আজ শনি এসেছে তোমাদের পোড়া কপালে বাসি ছাইয়ের পাণ্ডুর টিকা পরিয়ে দিতে।...

আজ ঝর ঝর বারিধারায় কান্না উঠেছে—'হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতি হারা।' তোমাদের জন্য গৃহ নাই, দয়া নাই, করুণা নাই। তাই দুর্দিনে তোমাদের ঘরে ডেকে নেবার কেউ নেই, তোমাদের ডাক দিয়েছে ওই ঝড় বাদলের উতল হাওয়া আর মাটির মায়ের সিক্ত কোল। এস আমার অনাহত লাঞ্ছিত ভাইয়েরা, আমরাই নতুন করে আমাদের জ্বালার জগৎ সৃষ্টি করবো। শনি হবে আমাদের কপালে জয় টিকা, 'ধুমকেতু' হবে আমাদের রথ, মরুভূমি হবে আমাদের মাতৃক্রোড়, মৃত্যু হবে আমাদের বধু।"

প্রচারিত হল বাঙলা দেশের সমাজের মর্মবাণী।

"আমাদের বিবাহের লাল চেলি দেশ-শত্রুর রক্ত-রাঙা উত্তরীয়, ভীম তরবারি আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের শয়নসাথী, ফাঁসির রশি আমাদের প্রিয়ার ভুজবন্ধন।...

আমরা অবিনশ্বর। একজন যায় একশোজন আসে। আমাদের একবিন্দু রক্ত ভূতলে পড়লে এক লক্ষ বিদ্রোহী নাগ শিশু বসুমতী বিদীর্ণ করে উঠে আসে। আমরা অদম্য। আমরা একজন বাঁধা পড়লে একশো জন ছাড়া পায়, সহস্র ভূজঙ্গ ছুটে এসে তার স্থান পূর্ণ করে। আমরা দেশ শত্রু বিভীষণের মহাকালান্তক কাল। আমরা অকাট্য ব্রহ্ম শাপ। পরীক্ষিতের মত, লখিন্দরের মত দুর্ভেদ্য ছিদ্রহীন দুর্গের মধ্যে থাকলেও দেশ শত্রুকে আমরা তক্ষক হয়ে, সূত্ররূপী কালসাপ হয়ে দংশন করে মারি।"

ধুমকেতু ছড়িয়ে পড়ল দেশের সর্বত্র। তরুণ সম্প্রদায়, বড়রা এমনকি বাড়ীর মহিলারাও পাঠক হল ধুমকেতুর।

এ পত্রিকার সঙ্গে যোগ দিলেন ভূপতি মজুমদার—মুজফ্‌ফর আহমদ তো আছেনই। আরও একটি নতুন মুখ এসে দেখা দিলেন—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নিলেন 'ত্রিশূল' ছদ্মনাম।

ধুমকেতুর উদ্দেশ্যের কথা লিখতে গিয়ে নজরুল:

"সর্বপ্রথম ধুমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝিনা কেননা ও-কথাটার মানে এক-এক মহারথী এক-এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সমস্ত দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো মোড়লি করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে মোড়লি করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন,

তাঁদের পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে, বোচকা-পুটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনও। আমাদেরও এই প্রার্থনা করার ভিক্ষা করার কুবিদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।

পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে। সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে।

আর বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বল্‌তে হবে, 'আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ।' বলতে হবে, যে যায় যাক, তাতে আমার হয়নি লয়।...

ইংরেজের আইন এ তো রাজদ্রোহিতাই।

অতএব ব্রিটিশ পুলিসের নেকনজরে পড়ে গেল ধুমকেতুর সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

বাইশে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হল নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে।' আর পুলিস সেই কবিতাকে লক্ষ্য করেই বের করল ওয়ারেন্ট।

হানা দিল ধুমকেতুর অফিসে।

ধুমকেতুর অফিস তখন কলেজ ষ্ট্রিটের ছোট্ট ঘর ছেড়ে এসেছে সাতনম্বর প্রতাপ চাটুজ্জের লেনে। একটা বড় ফ্ল্যাট। দোতলা বাড়ীর তিনটে ঘর নিয়ে এই নতুন অফিস।

কিন্তু কোথায় নজরুল ?

নজরুলকে সেদিন গ্রেপ্তার করতে পারে নি ব্রিটিশ পুলিশ। শুধু কয়েক কপি কাগজ নিয়েই সেদিন ব্রিটিশ পুলিশকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। অবশ্য গ্রেপ্তার হয়ে ছিলেন সেদিন মুদ্রাকর আফজল।

নজরুল পরোয়ানা নিয়ে পুলিশের ধুমকেতু অফিসে রেইডের পূর্বেই সমস্তিপুর চলে গিয়েছেন।

না, না, গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে থাকার উদ্দেশ্যে নজরুল সমস্তিপুর আসেননি। পুলিশের পরোয়ানার ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকার মত ইচ্ছে

কোনদিনই নজরুলের ছিলনা। আসলে নজরুল সমস্তিপুর গিয়েছিলেন গিরিবালা দেবীর ডাকে।

ডাক এসেছিল নজরুলের কাছে, তাকে আর প্রমীলাকে সমস্তিপুর হ'তে পৌঁছে দিতে হবে কুমিল্লায়।

নজরুল সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন নি।

সমস্তিপুর হতে কুমিল্লায় এলেন।

আর এখানেই গ্রেপ্তার হলেন নজরুল।

চিফ্‌ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আসামী হিসেবে তাকে নিয়ে আসা হোল কোলকাতায়?

অভিযোগ: তার কবিতা রাজদ্রোহমূলক। প্রত্যক্ষ রাজদ্রোহ মূলক প্রেরণা রয়েছে তার কবিতায়।

সুতরাং শুরু হল ব্রিটিশ আদালতে নজরুলের বিচার প্রহসন।

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো আয়োজন করতে নজরুলের মন সায় দিলনা। তিনি মাথা উঁচু করে কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

দাখিল করলেন তার লিখিত বিবৃতি:

"আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজ কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে রাজার মুকুট, আরেক ধারে ধুমকেতুর শিখা।

একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড, আর একজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড।

রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজ বেতন ভোগী রাজ কর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য —জাগ্রত ভগবান।

আমার বিচারক কেউ নিযুক্ত করে নি। এ মহা বিচারকের দৃষ্টিতে রাজা প্রজা ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারীর একতারা পাপাপাশি স্থান পায়। এর আইন—ন্যায়, ধর্ম। সে আইন কোনো বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরী করে নি। সে আইন বিশ্ব মানবের সত্য উপলব্ধি হ'তে সৃষ্ট। সে আইন সর্বজনীন সত্যের। সে আইন সার্বভৌমিক

ভগবানের! রাজার পক্ষে পরমাণু-পরিমাণে খণ্ড সৃষ্টি, আমার পক্ষে আদি অন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা।

রাজার পিছনে ক্ষুদ্র, আমার পিছনে রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার রাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।

আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্যে, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্যস্বরূপ।

সত্য স্বয়ং প্রকাশ। কোন রক্ত-আঁখি রাজদণ্ড তাকে নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ং প্রকাশের বীণা। যে বীণায় চিরসত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবান আছেন—চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের আর অন্ত নেই, সে যার সৃষ্টি তাকেই সে বন্দী করতে চায়। কিন্তু অহঙ্কার একদিন চোখের জলে ডুববেই ডুববে।

আমি মরব, রাজাও মরবে। আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আনায়নকারী বহু রাজাও মরেছে—কিন্তু কোন কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি—তার বানী মরেনি।…আমার হাতের বাঁশি কেড়ে নিলেই বাঁশির সুরের মৃত্যু হবে না। সুর আমার বাঁশিতে নয় সুর আমার মনে—অতএব দোষ বাঁশিরও নয় সুরেরও নয় দোষ আমাকে যে বাজায়। তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হচ্ছে তার জন্য দায়ী আমি নই, আমার বীণাও নয়—দোষ তাঁর যিনি আমার কণ্ঠে তার বীনা বাজান। সুতরাং রাজদ্রোহী আমি নই, রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দেবার মত রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নেই। তাঁকে বন্দী করবার মত পুলিশ কারাগার আজো সৃষ্টি হয় নি।

রাজার নিযুক্ত রাজ অনুবাদক রাজ ভাষায় সে বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে, তার প্রাণকে অনুবাদ করেনি তাঁর সত্যকে অনুবাদ করতে পারনি। তার অনুবাদে রাজানুগত্য ফুটে উঠেছে, কেননা তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য তেজ, আর প্রাণ। কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা, উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি ভগবানের আঁখিজন। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে করেছি।

আমি জানি এবং দেখেছি—আজ এই আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় একা দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবান দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নিরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডয়মান হন রাজ নিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হতে পারে না। এমনি বিচার প্রহসন যেদিন খৃষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল, সেদিনও ভগবান এমনি এসে নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল!…

বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়,

ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু তবু হয়তো সে শাস্তি দেবে। কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার, সে ন্যায়ের নয় সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজ ভৃত্য।

তবু জিজ্ঞাসা করছি, এই যে বিচারাসন, এ কার? রাজার না ধর্মের। এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না, তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে? না, ভগবান? অর্থ না আত্মপ্রসাদ?…

আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে, এরাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বানানো—একি সত্য হতে পারে? এ শাসন কি চির স্থায়ী হতে পারে? এই অন্যায় শাসন ক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার?…আমি জানি আমার কণ্ঠের ওই প্রলয় হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্ত পীড়িত আত্মার যন্ত্রণা চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারা বাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে। আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলণ্ডই ভারতের অধীন হত এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলণ্ডের অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মত অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত এই বিচারক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমি তো তাই এবং তেমনি করেই বলছি।

আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি—কারো তোষামদ করিনি, প্রশংসা বা প্রসাদের লোভে কারো পিছনে পোঁ ধরিনি—আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিনি, সমাজের, জাতির দেশের বিরুদ্ধে আমার তরবারি তীব্র আক্রমণে সমান বিদ্রোহ করেছে—তার জন্য ঘরে বা বাইরের বিদ্রূপ, অপমান লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করিনি, লাভ লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম উপলব্ধিকে বিক্রয় করিনি, নিজের সাধনালব্ধ আত্ম-প্রসাকে খাটো করিনি, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা।…

আমি অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তাহলে যে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার এই দেহ-মন্দির জাগ্রত দেবতার আসন

বলেই লোক এই মন্দিরের পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায় কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরে আর থাকবে কি ? একে শুধাবে কে ? তাই আমার কণ্ঠে কাল ভৈরবের প্রলয় তূর্য বেজে উঠেছিল, আমার হাতে ধুমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশানপুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণ রূপ ধরে ধ্বংস নাচন নেচেছিলেন। এ ধ্বংসনৃত্য নরসৃষ্টির পূর্ব সূচনা।……অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তার রক্ত আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম আমি সত্যরক্ষার, ন্যায় উদ্ধারের, বিশ্ব প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম-শ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছেন, অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন, প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাত প্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরাবান্বিত মনে করছি। কারাগার মুক্ত হয়ে আমি আমার আঘাত চিহ্নিত বুকে লাঞ্ছনা রক্ত ললাটে, তাঁর বরণ বাঁচা চরণ মূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়বে, তখন তাঁর সকরুণ প্রসাদের মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আমার অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আমি আবার তাঁর তরবারির ছায়া-তলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব।

সেই আজো-না আসা রক্ত-উষার আশা, আনন্দ, আমার কারাবাসকে — অমৃতের পুত্র আমি, হাসি গানের কলোচ্ছ্বাসে সবর্গ করে তুলব। চির শিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, দুঃখু নেই, কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ পীড়া-নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব মাভৈঃ! ভয় নেই।

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-পান্ত কোল এ অমৃতী পুত্রকে

ডাক দিয়েছে। পরাধীনা অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কিনা জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রুসিক্ত ধন্যবাদ দেব।

আবার বলছি, আমার ভয় নেই, দুঃখ নেই। আমি অমৃতস্যপুত্রঃ। আমি জানি—

ওই অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয়
সেই সত্য আমার ভাগ্য বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।"

চিফ্ প্রেসিডেন্স ম্যাজিস্ট্রের বিচারে নজরুল দোষী সাবস্ত্য হলেন। সুতরাং এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হল।

স্থান পেলেন আলিপুর সেণ্টাল জেলে। কয়েকটা মাস কেটেও গেল বেশ কিন্তু তাকে সাধারণ কয়েদির স্তরে নামিয়ে পাঠিয়ে দিল ব্রিটিশ শাসক হুগলি জেলে। সাধারণ কয়েদির পোষাক তাকে পরতে হল। দড়ি পড়ল কোমরে।

জেলসুপার আর্সটনের নির্লজ্জ অপশাসনে নজরুলের লাঞ্ছনার অবধি রইল না।

নজরুল শুরু করলেন অনশন, নিলজ্জ অত্যাচারের প্রতিবাদ তাঁকে জানাতেই হবে। তিনি তো সাধারণ কয়েদি নন, তবে তার জন্য ভদ্র ব্যবস্থা হবেই না বা কেন ?

দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে কোলকাতায় ডাকা হল জনসভা। সভা ঘোষণা করল, সরকারকে তার এই বর্বরতা প্রত্যাহার করতেই হবে।

নজরুল অনশন করে আছেন এ সংবাদ হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র।

রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করলেন নজরুলকে।

'অনশন ত্যাগ করো, আমাদের সাহিত্য তোমাকে দাবি করে।'

চঞ্চল হয়ে উঠলেন শরৎচন্দ্র।

অনেকেই জেলে গিয়ে সরাসরি নজরুলকে অনুরোধ করছেন অনশন ভঙ্গ করার জন্য।

অনুরোধ করে ফিরে গেছেন নলিনীকান্ত সরকার। হেডমাষ্টার কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের অনুরোধও নিষ্ফল হয়ে ফিরে গেছে।

গর্ভধারিনী মা এসে দাঁড়ালেন জেলগেটের বাইরে। কিন্তু নজরুল তার সঙ্গে দেখাই করলেন না। ফিরে গেলেন তিনি।

উনচল্লিশটি দিন কেটে গেল। এখনও নজরুল অনশন ভাঙেন নি। আর কতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন ?

নজরুল জেলখানায় অনশন করছেন এখবর কুমিল্লায় পৌঁছেছে যথাসময়। সংবাদ চাউর হয়ে গেছে বিরজা সুন্দরীর অন্তঃপুরেও।

বিরজা সুন্দরী অস্থির হয়ে উঠলেন।

কোথায় কুমিল্লা আর কোথায় হুগলী জেল ?

তিনি বুঝতে পারছেন চিঠি বা টেলিগ্রামে সুবিধে হবে না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আন্দোলনই একমাত্র ভরসা। কিন্তু সে আন্দোলনও ব্যর্থ হল শেষ পর্যন্ত।

বিরজা সুন্দরী নিজেও শুরু করলেন অনশন।

আত্মীয় স্বজনের এক প্রশ্ন : লাভ কি এতে ? নজরুলও জানতে পারবে না, অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকও জানতে পারবে না।

কিন্তু ভগবান ? তিনি তো সব জানছেন। তিনি তো জানেন, উপোসী ছেলের জন্য মায়ের অন্তরের হাহাকারের কথা।

বিরজা সুন্দরী দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নিজেই হুগলী যাবেন।

নজরুলকে মরতে দেব না। এতবড় একটা প্রাণকে অকালে ঝরে যেতে দেওয়া চলে না।

আজ বিরজা সুন্দরী তেরো দিন উপোসী। রওনা হলেন তিনি কুমিল্লা হতে ট্রেনে। হুগলী তাঁকে পৌছাতেই হবে। বাঁচাতেই হবে নজরুলকে।

পথের সব কষ্ট অস্বীকার করে বিরজা সুন্দরী পৌছালেন হুগলী।

নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি পেতে অসুবিধা হলনা তাঁর।

একী মা, তুমি ?

হ্যাঁ কুমিল্লা থেকে আসছি।

এত কষ্ট করে তুমি কেন এলে মা ?

এসেছি তোমাকে খাওয়াব বলে।

না, না মা তা হয় না। সরকার আমার দাবি মেনে না নিলে আমি অনশন ভাঙতে পারিনা।

দাবি মানবেই। তুমি অনশন ভঙ্গ করো নজরুল।

কিন্তু—

এ তোমার মায়ের দাবি সে দাবি তোমাকে মানতেই হবে।

মা! নজরুল নিজেকে সামলে রাখতে পারেন না। দু'চোখে অশ্রুধারা।

তুমি যদি মরো তবে তার আগে আমিই মরবো।

আমিও তো আজ তেরো দিন উপোসী। তুমি আত্মঘাতী হওয়ার আগে মাতৃহন্তা হবে।

নজরুল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন বিরজা সুন্দরীর মুখের দিকে। সন্তানের জন্য মা-এর অনশন। এত ভালবাসা এত মমতা।

না, মা তোমাকে ফিরিয়ে দেব না। আমি তোমার হাতেই অনশন ভাঙব। দাও কি খেতে দেবে ?

অনশন ভাঙলেন নজরুল।

জেলখানায় তার শ্রেণীর উন্নতি হল। পেলেন একটি হারমোনিয়ামও।

নজরুল তখন বহরমপুর জেলে রয়েছেন।

নলিনীকান্ত সরকার তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

নজরুল তার নলিনীদার জন্য উল্লাসে ফেটে পড়লেন।

তাহলে তুমি আমার অতিথি। জেলসুপারকে অনুরোধ করলেন, কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করতে যেন অতিথি সেবার ত্রুটি না ঘটে।

নজরুল জেলখানায় গানের আসর বসান। গান রচনা করেন আবার গেয়েও শোনান। অতিথি যারা আসেন তাদের শোনাতেও কসুর করেন না বিন্দুমাত্র।

অবশেষে জেলখানায় মেয়াদ ফুরাল।

উনিশ শ' তেইশের ডিসেম্বরে ছাড়া পেলেন নজরুল।

জেলখানা হতে মুক্তি পাওয়ার বেশ কয়েক মাস পরের ঘটনা।

নজরুল স্থির করলেন, প্রমীলাকে বিয়ে করবেন।

কিন্তু প্রমীলা? তিনি অর্পিতচিত্তা। কিন্তু প্রমীলা তো একা নয়। প্রমীলা অভিভাবক অভিভাবিকারা—তার আত্মীয় স্বজনের তার সমাজধর্ম—সবই তো এ বিয়ের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে?

নজরুল জানেন সে কথা। তবু পিছপা তিনি হবেন না। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে তিনি পিছিয়ে আসতে রাজী নন। এখানেও তিনি বিদ্রোহী।

কিন্তু গিরিবালা আত্মসমর্পিতা প্রমীলার মন বুঝেছেন। অতএব তিনি মেয়েকে নিয়ে চলে এলেন কোলকাতায়।

উনিশ শ' চব্বিশ সালের চব্বিশে এপ্রিল বিয়ে হল নজরুলের সঙ্গে প্রমীলার।

নজরুলের পক্ষ থেকে সেদিন অনেকে উপস্থিত থাকলেও প্রমীলার পক্ষে শুধু গিরিবালা।

এ বিয়েতে মানব ধর্মই রইল সর্বোপরে।

ভালবাসাই হল বিয়ের মন্ত্র।

কিন্তু দিন এল সমাজের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াইয়ের। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রামের।

'দরিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী দরিদ্র মোর ভাই।'

সমাপ্ত